গবেষণা পর্ষদ পত্রিকা

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

গবেষণা পর্ষদ পত্রিকা

দ্বিতীয় সংখ্যা : মাঘ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদক
জন্মজিৎ রায়

গবেষণা পর্ষদ
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

গবেষণা পর্ষদ পত্রিকা
প্রথম সংখ্যা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
শ্রীতরুণ দাস
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহক সমিতি
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

গবেষণা পর্ষদ
ড. জন্মজিৎ রায় (আহ্বায়ক)
ড. সুবীর কর (সদস্য)
ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য (সদস্য)
ড. বিশ্বতোষ চৌধুরী (সদস্য)
ড. পরিতোষচন্দ্র দত্ত (সদস্য)
শ্রী সঞ্জীব দেবলস্কর (সদস্য)

প্রচ্ছদ
পার্থ সোম

মুদ্রণ
সোম গ্রাফিক্স
স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ
আসাম-৭৮৮ ৭১০
দূরভাষ: ০৩৮৪৩-২৬০৪০৯

মূল্য : ১০০.০০ (একশত) টাকা

GAVESHANA PARSHAD PATRIKA: A Research Journal in Bengali. 2005, No. 2. Editor : Dr. Janmajit Roy, Head of the Deptt., Bengali, Karimganj College, Karimganj-788 710, Assam.

পত্রিকার বিভিন্ন লেখায় অভিব্যক্ত মতামত লেখকদের নিজস্ব, গবেষণা পর্ষদের নয়।

মুখবন্ধ

১৪০২ বঙ্গাব্দে গবেষণা পর্ষদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ নয় বৎসর অতিক্রান্ত প্রায়। অঞ্চলভিত্তিক গবেষণার যে লক্ষ্য সামনে রেখে পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করেছিল, তার গতিকে আরও বেগবান করতে হলে এই অঞ্চলের প্রবীণ গবেষকদের পাশাপাশি নবীন গবেষকদেরকেও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। এই উপত্যকার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ে বিস্তর গবেষণার সুযোগ রয়েছে। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে এই কাজ চালিয়েও যাচ্ছেন। কিন্তু এই প্রয়াস প্রায়ই থমকে যায় নানা অসুবিধার জন্য, অনেক ক্ষেত্রেই সেটা হচ্ছে আর্থিক প্রতিবন্ধকতার জন্য।

আমাদের এই গবেষণা পর্ষদ পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই উপত্যকার সকল প্রবীণ গবেষকদের জ্ঞান আর প্রজ্ঞা ও নবীনদের উৎসাহ-উদ্যোগকে একত্র করে একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষের দিকে চালিত করা। আর এর জন্য প্রয়োজন গবেষণা সংক্রান্ত কাজকর্মকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করা। কিন্তু আমাদের এই প্রয়াসের ক্ষেত্রেও অন্যতম প্রধান অন্তরায় আর্থিক অপ্রতুলতা। এই সব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই গবেষণা পর্ষদ পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। আশাকরি অঞ্চলভিত্তিক গবেষণার যে প্রয়াস আমরা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি, তা কিছুটা পরিমাণে হলেও পূরণ হবে। গবেষণা পর্ষদের আহ্বায়ক, সদস্যবর্গ ও লেখকদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। কারণ পত্রিকাটির প্রকাশ তাঁদের কঠোর পরিশ্রমেরই ফসল। এই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই এলাহাবাদ ব্যঙ্ক কর্তৃপক্ষকে এই সংখ্যাটি প্রকাশের জন্য। তারা এককালীন পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছেন। গবেষণা পর্ষদ পত্রিকার এই সংখ্যাটি পাঠক ও গবেষক মহলে সমাদৃত হবে, এই আমাদের প্রত্যাশা।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী
সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমিতি,
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

তরুণ দাস
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সমিতি
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

সম্পাদকের নিবেদন

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের গবেষণা পর্ষদ ১৯৯০ সালে গঠিত হওয়ার পর পর্ষদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালের ২৪শে মার্চ, অর্থাৎ ১৪০২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। ১৪০১ সালকে 'ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ' বলে চিহ্নিত করায় প্রথম সংখ্যায় বরাক উপত্যকার ইতিহাসকেই বিষয়বস্তু রূপে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এরপর প্রায় নয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার মাথায় দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। দীর্ঘ অপ্রকাশ-রহস্যের গ্রন্থিমোচনসূত্রে এখানে কিছু কথা বলা একান্ত প্রাসঙ্গিক। ২০০১ সালের মার্চ মাসে গবেষণা পর্ষদ পুনর্গঠিত হয় এবং তাতে বর্তমান সম্পাদককে পর্ষদের আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নবগঠিত পর্ষদের প্রথম সভা করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় ১লা শ্রাবণ, ১৪০৮ (শহিদ দিবস, ২১শে জুলাই, ২০০১)। হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় (২০শে শ্রাবণ, ১৪০৮/৫ই আগস্ট, ২০০১) আহ্বায়কের ওপর দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণামূলক নিবন্ধই কেবল দ্বিতীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হবে, এ-রকম পূর্ববর্তী একটি সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনাক্রমে সংশোধন করে সভায় ঠিক হয়, দ্বিতীয় সংখ্যাতে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী নিবন্ধও প্রকাশিত হবে। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ-কৃত 'হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডদানবিধি ও ঋণাদান-বিধি' প্রকাশের ব্যাপারে গবেষণা পর্ষদ ব্যাপৃত থাকায় গবেষণা পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ বিলম্বিত হয়। ২০০৩ সালের ৯ নভেম্বর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তারপর পত্রিকার জন্য লেখা আহ্বান করলে নভেম্বর মাসেই লেখা আসতে শুরু করে। বরাক উপত্যকার অর্থনীতি অথবা জনবিন্যাস বিষয়ে লিখতে বলা হয়েছিল এ অঞ্চলের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. সুশান্তকৃষ্ণ দাসকে। 'বরাক উপত্যকার জনবিন্যাস: ইতিহাস ও বর্তমান' শিরোনামে তিনি লেখার একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আমাদের আশা ও পরিকল্পনা অঙ্কুরিত হতে বাধা দেয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দিনপঞ্জি থেকে অসমাপ্ত রচনার খসড়াটি আমরা উদ্ধার করেছি। এ অঞ্চলের আরেকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. বাণীপ্রসন্ন মিশ্র লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও লেখা দিতে না পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। বর্তমান সংখ্যায় দুজন তরুণ লেখকের অর্থনীতি-বিষয়ক রচনা আমরা প্রকাশ করেছি। যথাস্থানে তাঁদের পরিচয় আছে।

এ সংখ্যায় বিশেষ আমন্ত্রিত লেখক ড. সুধাংশুশেখর তুঙ্গের একটি নিবন্ধ আমরা প্রকাশ করেছি। লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন কাছাড় জেলার বাংলা ভাষা আন্দোলন এ অঞ্চলের ভাষিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার রক্ষার রক্ষাকবচ রচনায় সমান মনোযোগী ছিল। রচনাটি থেকে এ অঞ্চলের অ-বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা

গড়ে তোলা সম্ভব। ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের নিবন্ধটি ততটা গুরুগম্ভীর হয়তো নয়, কিন্তু তথ্যভূয়িষ্ঠ। উপেন্দ্রকুমার করের গীতাঞ্জলির সমালোচনা বিষয়ক বইখানা (১৯১৪) যে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' নিয়ে লেখা প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ, এ কথা আমরা তাঁর নিবন্ধ থেকে জানতে পারছি। ড. সুজিৎ চৌধুরী শ্রীহট্ট-কাছাড়ের তাম্রলিপির ওপর নির্ভর করে আঞ্চলিক ইতিহাস এবং বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। দুর্ভাগ্যত, সুরমা উপত্যকার তাম্রশাসনগুলি কিন্তু আমাদের গুপ্তযুগে নিয়ে যেতে পারে না। অথচ গুপ্তযুগেই ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্মের লক্ষণীয় প্রসার ঘটে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গুপ্ত রাজবংশের অধস্তন সামন্তগণ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন ও ছোট ছোট অঞ্চলে শাসন করেন। শ্রীহট্টের নিধনপুরে আবিস্কৃত ভাস্করবর্মার পূর্বপুরুষ ভূতিবর্মার ভূমিদানপত্রের ভস্মীভূত তাম্রলিপির সময়টা ওই কালপর্বের মধ্যেই পড়ছে। অর্থাৎ সময়টা গুপ্তরাজবংশের পতনের কালের অব্যবহিত পরবর্তীকাল। সুতরাং শ্রীহট্টের বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য বিধ্বস্তপ্রায় গুপ্তযুগের উৎস থেকেই উৎসারিত বলে অনুমান করা যায়। ড. আনন্দমোহন মোহন্তও তাম্রলিপির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি-সাহিত্যের ওপর ভিত্তি করে একই যুগে পৌঁছতে চেয়েছেন। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্তরাজবংশের পতন, হুনদের আক্রমণ, অনিশ্চিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি যে শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণদের বসতিস্থাপনের পেছনে কাজ করেছিল, এ-রকম ধারণা অবশ্যই কষ্টকল্পনা নয়। ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য রাধামাধব দত্তের মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা পাঠকদের তৃপ্তি দেবে বলে বিশ্বাস করি। মনে পড়ে, করিমগঞ্জের 'অক্ষরবৃত্ত' পত্রিকার ১৪০০ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় (অক্টোবর, ১৯৯৩) বর্তমান সম্পাদকের 'বরাক উপত্যকার মনসাপুথি' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে 'মনসামঙ্গল বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য' বলে মন্তব্য করে এ অঞ্চলের কয়েকজন কবির রচনার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। এঁরা হচ্ছেন নারায়ণ দেব, ষষ্ঠীবর দত্ত, জগন্নাথ বৈদ্য, ভানুদাস শুক্লবৈদ্য ও বর্ধমান দত্ত। শ্রী ভট্টাচার্য রাধামাধবের 'পয়ার/চতুরক্ষরি মিল ছন্দ'কে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বলে গ্রহণ করেছেন। প্রদত্ত উদাহরণের চার মাত্রার পর্বগুলি অধিকাংশ স্থলে তিন মাত্রার বলেই গ্রাহ্য। অক্ষরলোপ স্বরবৃত্তে মাঝে মধ্যে হয়। কিন্তু সে হচ্ছে ব্যতিক্রম। 'চতুরক্ষরি মিল ছন্দ'-কে অক্ষরবৃত্ত ধরে নিলে মীমাংসা সহজ হয়। শ্রী সঞ্জীব দেবলস্কর তাঁর প্রবন্ধে লোকগীতির অন্তর্মূলীয় ঐক্যভাবনার স্বরূপ'সন্ধান করেছেন। তাঁর লেখায় বহিরঙ্গ প্রভাব গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু অন্তরঙ্গ প্রভাব, সহজ কথায় বংশগতি (heredity), প্রাধান্য পায় নি। হাসন রাজার পূর্বপুরুষ উত্তরভারত (খুব সম্ভবত আগ্রা) থেকে শ্রীহট্টে এসেছিলেন এবং তাঁর ঊর্ধ্বর্তন পুরুষের নাম ছিল লক্ষ্মীচরণ সিংহ। তবু বাঙালির যৌথ সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিকের ওপর আলোকপাত করছে প্রবন্ধটি। অচ্যুতচরণ চৌধুরী শ্রীহট্ট-কাছাড়ের আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার অগ্রপথিক। অচ্যুতচরণের লেখা চিঠিগুলি দিয়েছিলেন স্বর্গত জগদিন্দু সেন মহাশয়। বর্তমান সম্পাদক তাঁর কাছে এজন্যে বিশেষ কৃতজ্ঞ। এ সংখায় অর্থনীতি ও জনবিন্যাস বিষয়ক দুটি লেখা প্রকাশিত হল। আমাদের অঞ্চলের আর্থনীতিক অনগ্রসরতা নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন,

তাঁরা নিবন্ধদুটিতে কিছু নতুন সূত্র পেতে পারেন। প্রবন্ধ দুটি লিখেছেন যথাক্রমে ড. নিরঞ্জন রায় ও ড. পরিতোষচন্দ্র দত্ত।

ইচ্ছে থাকলেও লেখকদের আমরা stylesheet পাঠাতে পারি নি। তাই গবেষণা নিবন্ধে অনুসৃত বানানের বৈষম্য ও প্রকরণগত তারতম্য দূর করে ঐক্য বিধানের যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান 'অন্ধেন নীয়মানঃ যথান্ধঃ' অনুসরণ করা হয় নি। তবে তদ্ভব, দেশজ ও অ-বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে হ্রস্ব ই / হ্রস্ব উ-কার ব্যবহৃত হয়েছে। অপরাপর ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতির বানান-বিধি অনুসৃত হয়েছে। তবু কিছু অনবধানজনিত মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ ক্ষেত্রে পাঠকের স্নেহমার্জনা একান্ত কাম্য।

গবেষণা পর্যদ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা দেখলে যাঁরা আনন্দিত হতেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম সংখ্যা প্রকাশকালীন বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি বিজিৎকুমার চৌধুরী আজ আমাদের মধ্যে নেই। সম্মেলনের আরেক স্থানীয় কর্মকর্তা অরুণজ্যোতি সেনগুপ্ত কিছুদিন আগে লোকান্তরিত হয়েছেন। আর বর্তমান সংখ্যার নির্বাচিত লেখক সুশান্তকৃষ্ণ দাসের চিরবিদায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। এঁদের সকলের স্মৃতির প্রতি বিনম্রচিত্তে এখানে শ্রদ্ধা জানাই। ২০০৪ সালের শেষে 'সুনামি' যাদের জীবন কেড়ে নিয়েছে, তাদের আত্মার শান্তি ও সদ্গতি কামনা করি; সমবেদনা জানাই 'সুনামি'-বিধ্বস্ত অসংখ্য ছিন্নমূল ও সর্বস্বান্ত মানুষকে।

আগামী দিনগুলি যেন সুখের হয়। 'সর্বে অত্র সুখিনঃ সন্তু।' যাঁদের জন্য গবেষণা পর্যদ পত্রিকার সকল আয়োজন ও প্রয়াস, তাঁদের তৃপ্তি ও মনোরঞ্জনেই পত্রিকা প্রকাশের সার্থকতা।

সূচিপত্র

সুধাংশুশেখর তুঙ্গ	৯	কাছাড়ের কয়েকটি অপ্রধান ভাষা
উষারঞ্জন ভট্টাচার্য	১৮	করিমগঞ্জে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা
সুজিৎ চৌধুরী	২৪	সুরমা-বরাক উপত্যকার প্রাক-চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম: তাম্রলিপির আলোকে
অমলেন্দু ভট্টাচার্য	৩০	মনসামঙ্গল কাব্যের এক অনালোচিত কবি রাধামাধব দত্ত
আনন্দমোহন মোহন্ত	৫২	সুরমা-বরাক উপত্যকার স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত
জন্মজিৎ রায়	৬৬	অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি : শতবর্ষ পূর্বের চিঠিপত্রের আলোকে
সঞ্জীব দেবলস্কর	৭৬	শ্রীহট্ট-কাছাড়ে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে ঐক্যভাবনা
নিরঞ্জন রায়	৮৬	বরাক উপত্যকার কৃষি অর্থনীতি
পরিতোষচন্দ্র দত্ত	৯৩	আসামের বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক চিত্র : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

লেখক পরিচিতি

সুধাংশুশেখর তুঙ্গ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যচর্চাঃ ষোড়শ অষ্টাদশ শতক' (১৯৮৫) 'অ্যারিস্টটেলের পোয়েটিকস: তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা' (১৯৯২) 'Bengali and other Related Dialects of South Assam' (১৯৯৫) ও 'ঈশ্বর তুমি মানবপুত্র' (১৯৯৯)।

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ ও পত্রিকা' (১৯৯৩) 'রবীন্দ্রনাথ ও আসাম' (২০০১), 'রবীন্দ্রনাথ, কুইনি ও অন্যান্য' (২০০২) ও মৃত্যুঞ্জয়, (অনূদিত, ২০০৩)।

সুজিৎ চৌধুরী করিমগঞ্জের রবীন্দ্রসদন মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: 'প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার' (১৯৯০), 'শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস' (১৯৯২) ও 'Folklore and History : A Study of the Hindu Folkcults of the Barak Valley of Northeast India' (১৯৯৬)।

অমলেন্দু ভট্টাচার্য শিলচরের গুরুচরণ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রবক্তা। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে 'বরাক উপত্যকার বারমাসী গান' (১৯৮৪), রামকুমার নন্দী মজুমদারের 'মালিনীর উপাখ্যান' (সম্পাদিত, ১৯৯৮) ও 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য' (জহর সেনের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদিত)।

আনন্দমোহন মোহন্ত শিলচরের গুরুচরণ কলেজের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভিষগরত্ন কালীজয় ভট্টাচার্য ন্যায়পঞ্চাননের 'স্মৃতিরেখা' (সম্পাদিত, ১৯০২)।

জন্মজিৎ রায় করিমগঞ্জ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রবক্তা ও বিভাগীয় প্রধান। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: 'সার্ধশতকের বরাক উপত্যকা : সাহিত্য ও সমাজ' (১৯৯৪), 'Theory of Avatara and Divinity of Chaitanya' (২০০২) ও 'জীবনানন্দের কাব্যপাঠের ভূমিকা ও ব্যাখ্যাসূত্র' (২০০৪)।

সঞ্জীব দেবলস্কর শিলচরের একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরাজির প্রভাষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'কী করে লিখব' (১৯৯৯) ও 'যতীন্দ্রমোহন এবং গ্রাম কাছাড়ের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি' (২০০২)।

নিরঞ্জন রায় শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রবক্তা। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে 'Agricultral Growth and Regional Economic Development' (এম.পি.বেজবরুয়ার সঙ্গে একযোগে, ২০০২), এবং 'Economic Reforms and Agricultural Development in North East India' (কেয়া সেনগুপ্তার সঙ্গে একযোগে সম্পাদিত, ২০০৩)।

পরিতোষচন্দ্র দত্ত হাইলাকান্দির শ্রীকিষেণ সারদা কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রবক্তা।

কাছাড়ের কয়েকটি অপ্রধান ভাষা

সুধাংশুশেখর তুঙ্গ

হাইলাকন্দি, করিমগঞ্জ, কাছাড় এই তিনটি জেলা মিলিয়ে অবিভক্ত কাছাড়ের ভৌগোলিক আয়তন ৭০০০ বর্গ কিলোমিটার, প্রায় সিকিম রাজ্যের সমান। লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষের অধিক। স্বভাবতই, দক্ষিণ আসাম হিসাবে পরিচিত রাজ্য-কল্প এই অঞ্চলটি ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

কাছাড়ের জনসংখ্যার প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। সুতরাং বাংলাই এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা হলেও একমাত্র ভাষা নয়। বাকি যে ৫ শতাংশ অধিবাসী তারা সকলেই বাংলায় সমান পারদক্ষ হলেও তাদের অনেকের নিজস্ব মাতৃভাষা আছে এবং তারা সবাই যত্নের সহিত সে ভাষার চর্চা করে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভাষাগুলি সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। ভাষাবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এগুলিকে দুটি পৃথক বর্গে বিভক্ত করা যায়: ভারতীয় আর্য ও চীনা-তিব্বতী। এরা কেউই বহির্বিশ্বে পরিচিত নয় এবং এদের জনগৌরবও সেরকম নেই। সেজন্যই এদের অপ্রধান ভাষা হিসাবে আখ্যাত করা হচ্ছে। অপ্রধান এবং অকুলীন বলে চিহ্নিত হলেও ভাষাতত্ত্বের বিচারে এদের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। একে একে এদের আলোচনা করা যাক। প্রথমে ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর অপ্রধান ভাষাগুলি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী

কাছাড়ের অপ্রধান ভাষাগুলির মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সর্বাগ্রগণ্য ও জনসংখ্যার বিচারে সর্ববৃহৎ। ভাষাটির নাম বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী হলেও মণিপুরী ভাষার সঙ্গে এটি কোনক্রমে জড়িত নয়। প্রথমেই বলা ভাল যে মণিপুরী হল তিব্বত-চীনা পরিবারের কুকি-চীন উপশাখার অন্তর্গত একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা; অপরপক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় আর্য ভাষা পরিবারের সঙ্গে। সুতরাং উভয় ভাষার পরিবারিক ভিত্তি এবং গঠনগত চরিত্র একেবারেই পৃথক। তবে বিষ্ণুপ্রিয়ার শব্দ ভাণ্ডারে ১০ শতাংশ মণিপুরী অর্থাৎ মিতেই উপাদান আছে। কিন্তু ব্যাকরণ, গঠনপদ্ধতি ও বাকরীতি আর্য ভাষাগুলির অনুরূপ বলেই একে আর্য ভাষা পরিবারের ভাষা বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

মণিপুর রাজ খগেনবা (১৭শ শতক) রাজকার্যের প্রয়োজনে বাইরে থেকে কিছু সংখ্যক অ-মণিপুরী পরিবারকে আনিয়েছিলেন। পরে এই পরিবারগুলি বিষ্ণুপুর নামক অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি করেছিল এবং সেখানে এদের কোন কোন পুরুষ মণিপুরী (মিতেই) স্ত্রী গ্রহণ করেছিল। বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা বলে এরা মিতেইদের কাছে বিষ্ণুপুরীয়া নামে পরিচিত ছিল। সেই থেকে এরা বিষ্ণুপ্রিয়া (বিষ্ণুপুরীয়া) মণিপুরী নামে অভিহিত হয়। পরে অষ্টাদশ শতকের শেষে বা

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে এরা পার্শ্ববর্তী কাছাড়ে চলে আসে এবং সেখান থেকে ত্রিপুরা এসে কতক আশ্রয় নেয়। অধুনা এরা কাছাড়ের প্রায় সর্বত্র এবং ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের সংলগ্ন অঞ্চলে বিদ্যমান।

বহিরাগত বলে মণিপুরী মিতেইরা এদের 'মায়াং' বলে অভিহিত করত। 'মায়াং' মানে বহিরাগত বা বিদেশী। মিতেইরা বুকি-চীন শাখার অন্তর্গত, তাদের গাত্রবর্ণ পীতাভ; বিষ্ণুপ্রিয়াদের গাত্রবর্ণ শ্যামাভ, তাদের দৈহিক গঠনও বাঙালি এবং অসমীয়াদের অনুরূপ। অর্থাৎ এদের পূর্বপুরুষ শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মণিপুরের বিষ্ণুপুরে গিয়েছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সন্ধান অষ্টাদশ শতক থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ে এতে 'খুমল পুরাণ' নামে একটি কাব্য লিখিত হয়েছিল। এইটিই বিষ্ণুপ্রিয়াভাষার সর্বপ্রাচীন সাহিত্যকর্ম। ম্যাকুনক, ডালটন, গ্রীয়ারসন প্রভৃতি ভারতত্ত্ববিদ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে এই ভাষার প্রচলন ঊনবিংশ শতকের শুরুতেও মণিপুরে বিদ্যমান ছিল এবং হয়ত তার কিছু আগে এর উৎপত্তি হয়েছিল। মোটামুটি ভাবে, কোন অবস্থাতেই ভাষাটিকে অষ্টাদশ শতকের পূর্বে নেওয়া যায় না।

গ্রীয়ারসন তাঁর 'লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' (১৯০৩-২৫) গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে পূর্ব বাংলার বাংলা উপভাষার সঙ্গে এর অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পূর্ব বাংলার বাংলা উপভাষার সঙ্গে যে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্ক অতি নিবিড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে অসমীয়া ও পশ্চিমবঙ্গের স্ট্যাণ্ডার্ড কলোকুইয়াল ডায়ালেক্ট বা আদর্শ চলতি ভাষার কিছু কিছু লক্ষণও বিষ্ণুপ্রিয়াতে দেখা যায়। এটাই আশ্চর্যের। বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ব-প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি ভাষা, আদর্শ চলতি বাংলার উৎপত্তিস্থল কলিকাতা সন্নিহিত ভাগীরথীর অববাহিকায়। সেখান থেকে এত দূরের শ্রীহট্ট-কাছাড়-ত্রিপুরায় আদর্শ চলতি বাংলার কিছু বাগবিধি কেমন করে হাজির হল? আদর্শ চলতি বাংলার উৎপত্তি উনবিংশ শতকের আগে হয়নি। তার মানে উনবিংশ শতকেই আদর্শ বাংলার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এই সময়ে শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলে চা উৎপাদনের কাজ শুরু হলে ভাগীরথী তীরবর্তী শিক্ষিত বাঙালি বাবুরা এই উপলক্ষে এখানে এসেছিল, সেই সূত্রে এদের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াদের পরিচয় হয়েছিল বলে অনুমান করতে পারি।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও একে বাংলার উপভাষা বিশেষ বলে মনে করবার কারণ নেই। ক্ষুদ্র হলেও এর একটি লিখিত সাহিত্য আছে-অধুনা এই ভাষায় গল্প-কবিতা-উপন্যাস আদি রচিত হচ্ছে। লিখিত সাহিত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হলে উপভাষা আর উপভাষা থাকে না, ভাষায় উন্নীত হয়। বিষ্ণুপ্রিয়ার উৎস যেভাবেই সংঘটিত হোক, এটি যে এখন একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষা তা নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই। ভাষাটি এখন সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে, বিদ্যালয়ে পাঠ্য মাধ্যমরূপেও গৃহীত হয়েছে। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। তাঁর সক্রিয়তা ও উদ্যোগে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী

সাহিত্য পরিষদ গঠিত হয়েছে। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়া-ভাষী। তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার অভিধানে ৩০,০০০ শব্দ আছে। এরমধ্যে ২০,০০০ ইন্দো-এরিয়ান মূল থেকে এসেছে। এগুলি আকারে বাংলা অসমীয়ার অনুরূপ। বাকি শব্দগুলি মণিপুরী (মিতেই) ও নানা বিদেশী ভাষা, যথা ইংরেজি, ফার্সি, আরবি থেকে এসেছে, কিছু হিন্দি থেকেও গৃহীত হয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার আদল ও চেহারা কীরকম সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সে কথা মনে রেখে অতি সংক্ষেপে এর পরিচয় দেবার জন্য তিনটি আদর্শ বাক্যের উল্লেখ করা হল। এই তিনটি আদর্শ বাক্যের বাংলা মূল ও পরে তাদের বিষ্ণুপ্রিয়া রূপ এ-রকম :

আদর্শ বাংলা মূল :

১। তাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হল।
২। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে চলেছে।
৩। সত্যি কথা বলবি, না ঘা কতক দিতে হবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিরূপ :

১। তারে মুর খুরেইয়া চুনুখানি গসে দিয়া দেশেত্ত নিকালা দিলা।
২। আমার গাঙর কাদাদে হুক্কান্ গাট্ আহান বয়া জাগা।
৩। সইত্ত খতা মাত, না কিলখানি দেনা লাগতই?

এই অনুবাদ হাইলাকান্দি জেলার ঝাপিরবন্দ হতে গৃহীত। শিলচর ও করিমগঞ্জ জেলায় মোটামুটি এই কাঠামোই পাই, তবে সামান্য আঞ্চলিক পার্থক্যও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়াভাষীদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে করিমগঞ্জ জেলাতেই পাওয়া যায়-- বরাক উপত্যকার মোট বিষ্ণুপ্রিয়াভাষীর অর্ধাংশ এখানেই বাস করে, বাকি অর্ধাংশের মধ্যে ৬০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ হারে কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলার অধিবাসী। কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট (বাংলাদেশ) মিলিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াভাষীর জনসংখ্যা বর্তমানে এক লক্ষের মত হবে। এদের মধ্যে প্রায় ৭৫ হাজার বরাক উপত্যকার বাসিন্দা।

ধেয়ান

ধেয়ান একটি অখ্যাত ভাষা। 'লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায়' এর উল্লেখ নেই। কোন সেন্সাস রিপোর্টেও ভাষাটির কথা পাইনা। তবে উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ তাঁর 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (১৯১০ খ্রিঃ) এর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন এবং বলতে গেলে তিনিই সর্বপ্রথম ভাষাটিকে বহির্জগতের কাছে নিয়ে আসেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই লেখক ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে

কাছাড় সমীক্ষাকালে ভাষাটির সন্ধান পান।

ধেয়ানগণের পূর্বপুরুষ কোচ রাজ্য কুচবিহার থেকে এসেছিলেন। ষোড়শ শতকে কুচবিহার অতি সমৃদ্ধ ছিল। সে সময়ে সেখানকার শাসক ছিলেন সুবিখ্যাত কোচরাজা নরনারায়ণ। তিনি পার্শ্ববর্তী বহু রাজ্য জয় করে কোচ রাজ্যের আওতায় এনেছিলেন। এইভাবে রাজ্য জয়ের মানসে তিনি একবার তাঁর ভ্রাতা চিলারায়ের অধীনে কাছাড়ে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। চিলারায়ও কাছাড়-রাজকে পরাভূত করে তাঁর রাজ্য কোচ শাসনভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু কাছাড়ে কোচ শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্বদেশে বিপদ দেখা দিলে চিলারায় নরনারায়ণের আজ্ঞায় কাছাড় ত্যাগ করে কুচবিহারে ফিরে আসেন। তাঁর সৈন্য সামন্তও ফিরে আসে। কিন্তু কিছু সংখ্যক অসামরিক কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ কাছাড়ে থেকে যায়। এরা প্রথমে রাজধানী খাসপুরে বসতি করেছিল। পরে এরা অন্যান্য কয়েকটি অদূরবর্তী গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। চিলারায় ছিলেন নরনারায়ণের ডানহাত--একাধারে সেনাপতি ও মন্ত্রণাদাতা। এজন্য সর্বসাধারণে তাঁকে দেওয়ান বলে অভিহিত করত। চিলারায়ের কাছাড় ছেড়ে চলে যাবার পর তাঁর যেসব কর্মচারী খাসপুরে থেকে গেল তাদের স্থানীয় লোকেরা প্রথম প্রথম 'দেওয়ানের লোক' বলে আখ্যাত করত, পরে 'লোক' উঠে গিয়ে শুধু 'দেওয়ান' বলে ডাকত। সেই 'দেওয়ান' কাছাড়ের ধ্বনিগত বিশিষ্টতার জন্য ক্রমে 'ধেওয়ান' ও শেষে 'ধেয়ান' হয়ে গেল। এই 'ধেয়ান' নামে অভিহিত ব্যক্তিরা যে মূলে কুচবিহারের কোচ সে তত্ত্ব তখন কাছাড়বাসীরা জানত না। ধেয়ানদের ভাষাও একইভাবে 'ধেয়ান ভাষা' বলে পরিচিত হল।

আমি যখন ১৯৭৬ সালে কাছাড়ের বাংলা ভাষার সমীক্ষায় যাই, তখন শিলচর মহকুমার লারসিংহপার গ্রামে এদের সাক্ষাৎ পাই। লারসিংহপার ছাড়া আরো আটটি গ্রামে এদের বাস ছিল। এই গ্রামগুলি হল ঝাপিরবন্দ, থালিগ্রাম, দিল্লি, নারায়ণপুর, লক্ষীছরা, লাবক, লেবুরবন্দ ও হরিনগর। এগুলি সবই শিলচর মহকুমার অন্তর্গত। তার মানে শিলচর মহকুমার মধ্যেই ধেয়ানরা কেন্দ্রীভূত, দীর্ঘ ৪০০ বছরের ব্যবধানেও এরা শিলচর মহকুমা অতিক্রম করে অন্য কোথাও যায়নি। জনগোষ্ঠী হিসেবে এরা যে রীতিমত স্পর্শকাতর ও আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় তা এর থেকে বোঝা যায় এবং এই স্পর্শকাতরতা ও আত্মপ্রত্যয়ই এদের এই ৪০০ বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। গ্রামবাসীদের কাছে থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছিলাম, এদের মোট জনসংখ্যা সে সময় ৫,০০০ এর মত ছিল। এখন হয়ত সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এত ক্ষুদ্র একটি জিভাষী জনগোষ্ঠী যে নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে বিশাল বাংলাভাষীদের মধ্যে এরূপ দীর্ঘ সময় ধরে টিকে আছে, এটা একটা মস্ত বড় ব্যাপার।

ধেয়ানরা চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে অতিশয় শিষ্ট ও ভদ্র। পুরুষের পোষাক ধুতি ও পাঞ্জাবি, নারীরা সাধারণত শাড়িই পরিধান করে। ব্রাহ্মণদের মত এরা উপবীত ধারণ করে। পেশায় সকলেই কৃষিজীবী, বাড়িতে এণ্ডির চাষও করে। আচরণ বৈষ্ণবদের মত, খাদ্য তালিকায় আমিষ বলতে কেবল মাছই থাকে, ডিম মাংস নিষিদ্ধ, এমনকি পেঁয়াজ রশুনও বর্জিত।

ধেয়ানরা কোচ বংশীয় বটে, বোড়োদের মত এদের গাত্রবর্ণ পীতাভ নয়, বাঙালি-অসমীয়াদের মত শ্যামাভ। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এরা বিশুদ্ধ রক্তধারাবাহী কুকি-চীন গোষ্ঠীর অনুরূপ নয়, বড়ো-নাগা গোষ্ঠীর মিশ্র রক্তধারাবাহী বাঙালি-অসমীয়া জাতির অনুরূপ। ষোড়শ শতকের কোচরাও বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী ছিল না। কোচ ভাষাও সে সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্র উপাদানে পূর্ণ ছিল। এখানকার ধেয়ানরা সেই মিশ্র ভাষারীতি বহন করে চলেছে। বাংলা ও অসমীয়া রীতিই হল ধেয়ান ভাষার মিশ্র উপাদান-এক কথায় বাংলা, অসমীয়া এবং কোচ ভাষার সংমিশ্রণে ধেয়ান গঠিত হয়েছে। তবে এতে এখন কোচ উপাদান নেহাতই স্বল্প। ষোড়শ শতকের কোচ ভাষায় যে মিশ্রণ ছিল তা উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম আসামের ভাষার ফলিত রূপ। লক্ষণীয় যে এই উভয় অঞ্চলের ভাষারীতির মধ্যে প্রচুর সমতা আছে। ধেয়ান ভাষার পরিমণ্ডলে এখন অসমীয়ার উপস্থিতি নেই। তৎসত্ত্বেও এতে কিছু কিছু অসমীয়া বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এর কারণ, ষোড়শ শতকের যে কোচ ভাষারীতি নিয়ে ধেয়ানরা কাছাড়ে এসেছিল তার মধ্যে যথেষ্ট অসমীয়া উপাদান ছিল, এখন তার কিছু অবশিষ্ট আছে। অবশ্য তা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে ও আনুপাতিক ভাবে বাংলার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলা মানে কাছাড়ে প্রচলিত বাংলা। তাহলেও ধেয়ান ভাষার ধ্বনিগুলি এখনো বহুক্ষেত্রে প্রাচীনরূপ বজায় রেখেছে। কাছাড়ের বাংলা ধ্বনিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিশয় সৃষ্ট ও কর্ষণ-জড়িত। ধেয়ান ধ্বনি এরূপ নয়--তা সরল ও শিষ্ট। এবার ধেয়ান ভাষার তিনটি আদর্শ বাক্যের রূপ :

১। তার মুর খুরাই বিদেশেত্ খেদাই দিলুক।

২। আমার গাঅর গুরিয়ে গুরিয়ে অট হুরু ডং গসে।

৩। হসা কথা বোল, নাই ত মারি দিম।

এখানে কেবল একটিমাত্র কোচ শব্দ পাচ্ছি-ডং। কাছাড়ের বাংলা, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতিতে তা 'গাঙ' হয়েছে, বিশুদ্ধ বাংলার মত। 'দিলুক', 'দিম' ক্রিয়াগুলিতে অসমীয়া বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। অবশ্য চট্টগ্রামী বাংলা, পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা, এমনকি রঙপুর বাংলার কিছু কিছু নিদর্শনও ধেয়ান ভাষায় পাওয়া যায়। কিন্তু বহু উল্লেখযোগ্য অসমীয়া নিদর্শন অনুপস্থিত। কারণ অতিশয় স্পষ্ট।

চা-বাগিচার ভাষা

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কাছাড়ে ব্যাপক হারে চা-বাগান খোলা হলে বাগানের কাজের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এই শ্রমিক নিকটে পাওয়া যেত না। ফলে বাইরে থেকে ব্যাপক হারে শ্রমিক আমদানি করতে হয়। বাইরে থেকে মানে হিন্দি, ভোজপুরি-ভাষী মধ্য-উত্তর ভারত, ওড়িয়া-ভাষী উড়িষ্যা ও তামিল-তেলুগুভাষী দক্ষিণ ভারত। বিহার ও বঙ্গ দেশ থেকে কিছু সাঁওতালি-ভাষী সাঁওতালও এসেছিল। কাছাড়ের 'বাবু' বাংলার সঙ্গে এইসব

ভাষার মিশ্রণের ফলে চা-বাগানগুলিতে অল্প কালের মধ্যে কতগুলি মিশ্র ভাষার সৃষ্টি হল। এই মিশ্র ভাষাগুলি হিন্দি-ভোজপুরি বাংলা, ওড়িয়া বাংলা, তামিল-বাংলা, সাঁওতালি বাংলা ইত্যাদি। এই মর্মে এই কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে চা-বাগানগুলিতে যে বাংলা ব্যবহৃত হত, সেটা স্থানীয় 'কাছাড়ী' বাংলা ছিল না, তা চলতি আদর্শ বাংলাই ছিল। বাগানের কেরানির কাজের জন্য পশ্চিমবাংলা থেকে শিক্ষিত বাঙালি বাবুরাই আসত। শ্রমিকদের সঙ্গে এই বাবুদের প্রত্যক্ষ ও সারাক্ষণের যোগাযোগ থাকায়, এই বাবুদের বাংলার সঙ্গে শ্রমিকদের ভাষার মিশ্রণ হয়েছিল। স্থানীয় বাংলার সঙ্গে এরকম মিশ্রণের সুযোগ ছিল না।

বেশিরভাগ চা-শ্রমিক উত্তর-মধ্য ভারত থেকে এসেছিল বলে কাছাড়ের বাগানগুলিতে হিন্দি-ভোজপুরি-বাংলারই প্রাধান্য। ওড়িয়া-বাংলার চলও যথেষ্ট আছে। সাঁওতালি-বাংলা সেরকম কিছু নেই এবং সাঁওতালি অভিহিত ভাষা আসলে সাঁওতালি নয়, সাঁওতালদের দ্বারা ব্যবহৃত ভোজপুরি বাংলা। তামিল-বাংলার সন্ধান আমি পাইনি। তামিল শ্রমিকদের শিবিরে গিয়ে দেখেছি তারা তামিল ভাষা একেবারেই ভুলে গেছে, সে জায়গায় তারা বিশুদ্ধ বাংলায় কথাবার্তা বলে। আমার সঙ্গে কথাবার্তার সময় একজন তামিল যুবক শুদ্ধ বাংলায় বলেছিল: 'এইটাই আমাদের মাতৃভাষা।' টীকা নিষ্প্রয়োজন।

কাছাড়ের চা বাগানের সংখ্যা ১১৪টি (১৯৭৩ সালের সমীক্ষা অনুসারে)। এই বাগানগুলির কর্মচারীর সংখ্যা ৪৮,০০০, প্রতি শ্রমিক পরিবারে ৫জন করে সদস্য ধরলে জন-ভাষীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯০,০০০ অর্থাৎ প্রায় দু লক্ষ। এদের মধ্যে ভোজপুরি-বাংলা ভাষীর সংখ্যাই সর্বাধিক, মোট সংখ্যার অর্ধেক। প্রায় প্রতিটি বাগানে এই ভোজপুরিভাষী শ্রমিক গোষ্ঠী আছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাগানগুলি হল ইছাবিল, বৈঠাখাল, বালাধন, হাতিচেরা, নারায়ণপুর, কাশীপুর, খাসপুর, দামচেরা, পাথারকান্দি, উধারবন্দ, ধুয়ারবন্দ, বাঁশকান্দি, মধুরবন্দ প্রভৃতি। ভোজপুরি-বাংলার তিনটি আদর্শ বাক্য:

১। ওকর মাথা মুড়কে পানি ঢালকে খেদা দেলি।

২। হামনেকে গাঁওকে কিনারে ছোটা এক নদী চলগেইল্ হ্যায়।

৩। সাচ্চা বোলবে, না দেহি এক থাপ্পড়?

এটি কাশীপুর বাগান থেকে গৃহীত। বাগান ভেদে ভাষাভঙ্গির অল্পস্বল্প তারতম্য হয়। যেমন হাতিচেরা বাগানের ভোজপুরি-বাংলায় তৃতীয় বাক্যটি হয়েছে: সাচ্চা বাত বোলবি, না মার খাইবা? এখানে লৌকিক অর্থাৎ আঞ্চলিক রীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ দেখতে পাচ্ছি। কারণটাও যথেষ্ট স্পষ্ট। এ বাগানের লোকেরা বেশিরভাগই বাগানের কাজ না করে বাইরে গিয়ে ধান চাষে মন দিয়েছে। ভোজপুরি ধ্বনিগুলি বিশুদ্ধভাবেই এসব বাগানের ভাষায় রক্ষিত, কোথাও কোথাও সামান্য চলতি বাংলার প্রভাব দেখা যায়।

ওড়িয়া-ভাষী পরিবারও ঐসব বাগানে আছে, এবং তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট বেশি। প্রায়

৬০/৭০ হাজার ব্যক্তি (১৯৭৩-৭৬) ওড়িয়া-বাংলায় কথা বলে। উড়িষ্যার দক্ষিণ পূর্বের কয়েকটি জেলা থেকে ওড়িয়াভাষীরা কাছাড়ে এসেছিল। কাজেই এই অঞ্চলের ওড়িয়া ভাষার ছাপ ওড়িয়া-বাংলায় লক্ষিত। পশ্চিম উড়িষ্যার ভাষাগত ছাপ এখানে অনুপস্থিত।
তিনটি আদর্শ ওড়িয়া-বাংলা বাক্য :

১। তার মুড়র চুল বার করি কলা লগাই বাগানর বার করি দিল্লা।

২। আমার বাগানর কিনারে গট্টে গাঙ যাউছি।

৩। ভাল কথা কোইবু, না পিটা খাইবু?

এটি বৈঠাখাল বাগান থেকে সংগৃহীত। অন্যান্য বাগানগুলিতে মোটামুটি এই একই ধরনের ভাষাভঙ্গি দেখা যায়। তবে ওড়িয়া-বাংলার যেটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, সেটি হল এর ধ্বনি, বিশেষত ব্যঞ্জন ধ্বনি। ওড়িয়া ব্যঞ্জনধ্বনির কতগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে, যেগুলি পূর্বভারতের অন্য আর্য ভাষায় নেই। এরকম একটি বিশেষ ওড়িয়া বৈশিষ্ট্য হল/ন/এবং/ল/ ব্যঞ্জনের মূধন্যীভবন। কাছাড়ের ওড়িয়া-বাংলা চা-বাগানি ভাষায়ও এ বৈশিষ্ট্য প্রকট ভাবে রক্ষিত। ঠিক এই রকম ধ্বনিগতী আর একটি ওড়িয়া বিশেষত্ব হল শব্দান্ত/অ/। ওড়িয়া শব্দ কদাপি হলন্ত হয় না। অন্যান্য আর্য ভাষায় যেখানে শব্দান্ত স্বরহীন থাকে, সেখানেও ওড়িয়া শব্দ/অ/স্বরে সমাপ্ত হয়। যেমন, বাংলা-অসমীয়া-হিন্দি 'জল' (উচ্চারণ জল্), কিন্তু ওড়িয়া 'জল্-অ'। ওপরে উদ্ধৃত বাক্য তিনটিতে এইভাবে 'মুড়র', 'চুল', বার প্রভৃতি শব্দে 'অ' যুক্ত হয়ে মুড়র্-অ, চুল্-অ, বার-অ প্রভৃতি হয়েছে।

চা-বাগানের ভাষা সমীক্ষাকালে আমি মাত্র দু একজন সাঁওতালির দেখা পেয়েছিলাম। এই রকম একজন সাঁওতালি বালকের ভাষায় আদর্শ তিনটি বাক্য এইভাবে পাওয়া গেছে:

১। উকার মাথাকে চুল ছইলকে কাড়িয়া লাগাইকে বাহার কারকে খেদায় দেলাক।

২। হামনেকের নদীকে কিনারে একটা গাং যাত।

৩। ঠিকে ঠিকে বোল, নাই বোলে হোলে আর পিটব।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এর মধ্যে সাঁওতালির কোন চিহ্নই নেই। কিন্তু এই ভাবেই বৈঠাখাল বাগানের সাঁওতালরা কথা বলে। এতে হিন্দুস্থানি অর্থাৎ ভোজপুরি ও বাংলার মিশ্রণ হয়েছে, তবে ঠিক ভোজপুরিভাষীরা যেমন ভাবে বলে তেমন ভাবে নয়। ঐটুকুই যা আলাদা। তবে কাছাড়ের কোন কোন বাগানে ছিটে ফোঁটা সাঁওতালি-বাংলার ব্যবহার হয়। যেমন দৃষ্টান্তের তৃতীয় বাক্যটি আর এক জায়গায় এইভাবে পাচ্ছি: সত্যি কথা রোড়, ইয়ে ঝুটা যদি বোড়স্ তো ভাল জমান। এখানে 'রোড়' ও 'জমান' দুটি সাঁওতালি শব্দ, 'রোড়স্' সাঁওতালি শব্দমূল ঠিক কাছাড়ি-বাংলার নিয়মে গঠিত পূর্ণাঙ্গ শব্দ (ক্রিয়াপদ)।

কাছাড়ের চা-বাগানে আর একটি ভাষা আছে, একে চা-বাগিচার সাধারণ ভাষা বলে

অভিহিত করা যায়। ভোজপুরি, ওড়িয়া, সাঁওতালি, বাঙালি নির্বিশেষে সমস্ত চা বাগানের সকল ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার সময় এই ভাষা ব্যবহার করে। এতে সমস্ত অঞ্চলের সকল ভাষার উপাদান আছে, আঞ্চলিক কাছাড়-বাংলা যেমন, তেমনি বিশুদ্ধ আদর্শ চলতি বাংলা। ফলে এটি সকল ভাষা-গোষ্ঠীর মানে চা-বাগানের ভাষা-গোষ্ঠীর কাছে লিঙ্গুয়া ফ্রাংকার মত কাজ করে। ভাষাটি চা-বাগানের বাইরে কাছাড়ের অন্যান্য অঞ্চলেও সহজে বোধ্য। এই ভাষার তিনটি আদর্শ বাক্যরূপ :

১। ওয়ার মাথা ছিলাই চুনকালি লাগাই উয়াকে বাগানলে বার করে দিল।

২। হামাদের বাগানের কিনারে একটা ছোট গাঙ বইছে।

৩। সাচ্চা সাচ্চা বল, নইলে এখন মার খাবিস।

আদর্শ চলতি বাংলার প্রভাব এতে রীতিমত দৃঢ়।

তিব্বত-চীনা গোষ্ঠীর ভাষা

কাছাড়ে তিব্বত-চীনা গোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি ভাষা আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল মণিপুরী বা মিতেই। কুকি-চীন উপশাখার এই ভাষাটি অবশ্য মণিপুরের প্রধান ভাষা মিতেই-র সহিত অভিন্ন। ব্রিটিশ অধিগ্রহণের আগে, অষ্টাদশ শতকে দুর্বল কাছাড়ি রাজত্বের সময়ে মণিপুরের কয়েকজন রাজা কাছাড়ের বেশ কিছু অংশ তাঁদের দখলে এনেছিলেন। সেই সূত্রে বহু মণিপুরী রাজপুরুষ ও তাঁদের পরিবারবর্গ এখানে এসেছিলেন, বেশ কিছু সাধারণ মণিপুরী পরিবারও এসেছিল। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে (১৮৩২ খ্রিঃ) ব্রিটিশ শাসনে আসার পরে কাছাড়ে মণিপুরী কর্তৃত্বের অবসান হয়। কিন্তু তাহলেও ইতিপূর্বে যেসব সাধারণ মণিপুরী এসেছিল তারা থেকে গেল, তাদের পরিবারবর্গও থেকে গেল, কিছু নতুন করে মণিপুর থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করল। তাদের বংশধরগণ আজ কাছাড়ের মণিপুরী বা মিতেই ভাষী জনগোষ্ঠী। এদের জনসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য, প্রায় এক লক্ষ হবে।

মিতেই ভাষার তিনটি আদর্শ বাক্য :

১। মহাব্বু এয়ামথিমা তউবিদুনা লইবাক্ টুগাগিয়া টান্ জোখিম্পা।

২। অইথ্ ইগা গুল্লা মনাক্কা পিকল্লা তুরেল্ আমা চেল্লি।

৩। আচুম্বা ওয়া ঙগাঙগদ্রা, নদগা ইদ্রা?

এটি হাইলাকান্দি জেলার মাদারিপার অঞ্চল থেকে গৃহীত। সামান্য আঞ্চলিকতার তারতম্য ছাড়া মণিপুরের মিতেইর সঙ্গে এ ভাষার কোন পার্থক্য নেই।

মিতেই (অর্থাৎ মণিপুরী মিতেই) প্রসিদ্ধ ভাষা, ললিত কলা আকাদেমি দ্বারা স্বীকৃত, অচিরে হয়ত ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃতি পাবে।

এ অঞ্চলে আরো কয়েকটি তিব্বত-চীনা গোষ্ঠীর ভাষা আছে, এগুলি হল কাছাড়ি বা দিমাসা (জনসংখ্যা ২০,০০০) টিপ্রা (জনসংখ্যা ২০,০০০), রেয়াং (জনসংখ্যা ৮,০০০) ও হানাম (জনসংখ্যা ২,০০০)। এসব ভাষা বহির্জগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত বললেই হয়।

উৎস গ্রন্থ

S.S. Tunga: Bengali and Other Related Dialects of South Assam, New Delhi 1995.

করিমগঞ্জে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

১৯৯৭ সনের নভেম্বর মাসের এক শনিবার।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরমা-বরাকের সংযোগ-সম্পর্কের তথ্যসন্ধানে কাছাড়ে এসেছি। ঘুরছি এদিক-ওদিক, নির্বাচিত লক্ষ্যে। দেবব্রত দত্তমশায়ের কাছে পেয়েছি এক পেয়েছি এক মূল্যবান তথ্য, পেয়েছি এক মূল্যবান নথি আগের দিন। ১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথ যখন শ্রীহট্ট এলেন মুরারিচাঁদ কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে তোলা হয়েছিল একখানি ফোটো- গ্রুপ ফোটোটিরই ছবি আছে শিলচরে জেল রোডের এক বাড়িতে।

গৃহস্বামী প্রয়াত— জ্ঞানচন্দ্র পুরকায়স্থ। দেবব্রতবাবু আরও বলেছেন, 'ছবিখানা বোধ হয় দেয়ালশোভন হয়ে আছে, দ্যাখো পাও কি-না।' ওইদিন দুপুরের মধ্যেই ঐতিহাসিক ছবিটি নামিয়ে আনা হল, ফোটোকপি করিয়ে নতুন করে বাঁধিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হল মালিককে, জ্ঞানচন্দ্রের পুত্র নীহারেন্দু পুরকায়স্থকে। দেবব্রতবাবু সেই সকালেই বললেন, 'মৌলভিবাজারের মুন্সেফ উপেন্দ্রকুমার করের (১৮৭৭-১৯৫৫) 'গীতাঞ্জলি সমালোচনা: প্রতিবাদ' বইটিও কপি করিয়ে নিতে পার।' রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষণে 'সুরমা' পত্রিকার সম্পাদক ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ ও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন তাঁর কাগজের কয়েকটি সংখ্যায়। এরপরই ওই কাগজে উপেন্দ্রকুমার করের 'গীতাঞ্জলি সমালোচনা: প্রতিবাদ' বেরোয় কয়েক কিস্তিতে। বই হয়ে বেরোলে (১৯১৪) রবীন্দ্রনাথকে এক কপি উপহার পাঠিয়েছিলেন উপেন্দ্রকুমার। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন। অসামান্য সেই উত্তর। শঙ্খ ঘোষ মশায়ের কথায়, উপেনবাবুর বইটিই গীতাঞ্জলি বিষয়ে প্রথম পুস্তক। দেবব্রতবাবু বলেন নি, কিন্তু আমি বিশ্বভারতীর প্রদর্শশালায় গিয়ে দেখেছি দেবব্রতবাবুর একখানি চিঠি, রথী ঠাকুরকে লেখা। উপেন্দ্রকুমার মূল চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দেবব্রতবাবুর কাছে, দেবব্রতবাবু সেটি পাঠিয়ে দেন রথী ঠাকুরকে। দেবব্রত সঙ্গে অনুমতি চেয়েছিলেন তাঁর, অনুমতি পেলে চিঠিখানি গুরুচরণ কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হবে। দেবব্রতবাবু তখন গুরুচরণ কলেজের অধ্যাপক। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়নি। অনুমান করা যায় কবিপুত্র নীরব ছিলেন। উপেনবাবুর উদ্দেশে মুক্তাক্ষরে লেখা কবির চিঠি বিশ্বভারতীতে দেখেছি।

দেবব্রতবাবুর থেকে দু'টি প্রাপ্তিই অসামান্য, প্রবল আনন্দদায়ক। এই ধনার্জনে দুই সুজন আমার সঙ্গী ছিলেন, এদের একজন শিলচর জয়ন্তী প্রেসের কর্ণধার গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (আমার পিতৃবন্ধু গজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের পুত্র), অন্যজন অধ্যাপক অমলেন্দু ভট্টাচার্য।

পরের দিনই ওই শনিবার। আমি গেছি এক অগ্রজের বাড়ি। আমার কাজ নিয়েই কথাবার্তা। অবশ্যই আড্ডার মেজাজে। অদূরে এক নবপরিচিত যুবক--তিনি শ্রোতা। তাঁর নাম শোভনলাল ভট্টাচার্য। মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'রবীন্দ্রনাথ করিমগঞ্জে এসেছিলেন।'

যুবকের কথায় যদিও চমকের উপাদান ছিল, আমাকে খুশি করার মতো জোর ছিল না; কারণ কথাটি অসত্য ও অবান্তর। যুবক আরও একবার নয়, দু-দুবার একই কথা উচ্চারণ করলেন, তখন গৃহস্বামী তাকে নিরস্ত করার জন্যেই বলে উঠলেন, 'প্রমাণ থাকে, এনে দেখিয়ো।' আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের আসাম ভ্রমণের প্রতিদিনের কথা এর নখদর্পণে।'

যুবক কোনো মন্তব্য না করে উঠে গেলেন।

স্বস্তি, উনি আর আসবেন না।

কিন্তু এলেন, এলেন রাত ন'টার দিকে। হাতে একখানা খণ্ডিত ম্যাগাজিন। খুলে দেখিয়ে দিলেন 'করিমগঞ্জে রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি রচনা। ভাবি-গাঁজাখুরি ব্যাপার অনেকেই লেখেন, বড়রাও লেখেন-মন্দ কি, পড়া যাক-যথাসময়ে যথাস্থানে লিখিতভাবে নস্যাৎ করা যাবে।

করিমগঞ্জ পাবলিক হাইস্কুলের ম্যাগাজিন 'প্রদীপ', ১৯৬১-র একটি সংখ্যার খণ্ডাংশ। রচনার নীচে লেখা আছে, 'প্রদীপের গত সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।' লেখকের নাম নেই। যতই এগোই, মজে যাই লেখায়। গদ্য টানছে, ঘটনা টানছে। এ-যেন বিশ্বাস্য অসম্ভবপরতা। দিনের হিসেবির বচনেও দম্ভ থাকা অন্যায়-একটা দিন ত চব্বিশটা ঘণ্টার সমষ্টি! অগ্রজকে দেখাতেই মিনিটখানেক পড়েই বললেন, 'এ কুমুদ লুহের লেখা হবে।'

কুমুদ লুহটি কে? প্রথম যেন শুনলাম এই নাম। লৌহ বা লোহ বা Law জানি, লুহ পদবি পাইনি। শুনলাম কুমুদরঞ্জন লুহর কথা। মাসকয়েক পর আনন্দবাজার পত্রিকায় সেকালে প্রকাশিত কয়েকটি করিমগঞ্জ-সংবাদের দিকে দৃষ্টি গেল। বারকয়েক কুমুদরঞ্জনের কথা আছে, তবে 'লুহ' রূপে নয়, গুহ রূপে; কুমুদরঞ্জন গুহ। প্রতিবেদকের লেখার চটজলদি মার্জনা করে দিয়েছেন সাব-এডিটর বা কম্পোজিটর মশাই। এও এক হ্যাপা!

কাছাকাছি সময়ে আসামবাসী কোনো বাঙালির রবীন্দ্র বিষয়ক কোনো উৎকৃষ্ট রচনার সন্ধান করতে গিয়ে 'রবিপ্রকাশ' (১৯৬১) খুললাম আবার। যা চাইছিলাম তা-ই পেয়ে গেলাম। চমৎকার একটি লেখা, 'আমাদের শান্তিনিকেতন', লেখক কুমুদরঞ্জন লুহ-প্রাক্তন শান্তিনিকেতনিক। কবি যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন, লুহ তখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র। শান্তিনিকেতনের বিশ্বস্ত ও উপভোগ্য দীর্ঘ বিবরণীটি বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও অসম' নথিপত্র সংকলনের এক উজ্জ্বল অঙ্গ।

'প্রদীপ' পত্রিকার রচনায় কুমুদরঞ্জন লিখেছেন, '১৯১৮ ইংরেজীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পাঁচ বৎসর পরে থামিয়াছে। যুদ্ধকালীন সঙ্কটের সময় ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা লাভের জন্য স্বায়ত্তশাসনের যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যুদ্ধাবসানে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বিলাত হইতে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের প্রস্তাব আসিয়াছে। এই সংস্কারে ভারতবাসীর অন্তরে নৈরাশ্য ও অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে। অধিকন্তু যুদ্ধের সময় ভারতরক্ষা আইন সাময়িকভাবে চালু করিয়া ভারতবাসীর যে সব ন্যায় সংগত অধিকার হরণ করা হইয়াছিল-সেই ভারতরক্ষা আইনই সামান্য অদলবদল করিয়া রাউলাট আইনে পরিণত

করিয়া চিরদিনের জন্য ভারতবাসীর নাগরিক অধিকার হরণের উদ্যোগ হওয়ায় দেশে বিক্ষোভের সঞ্চার হইতেছিল।

দেশের এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কবি শ্রীহট্টে আসেন। সন্ধ্যার পর সুরমা মেইলে কবি করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছেন। তখন সুরমা মেইল মাত্র তিন মিনিটের জন্য করিমগঞ্জ স্টেশনে থামিত। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থায় সেই দিন সুরমা মেইল করিমগঞ্জে বিশ মিনিট অপেক্ষা করে। কবির সঙ্গে ছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরী ও তাঁহার পত্নী ইন্দুবালা দেবী বদরপুর হইতে কবির সহযাত্রী হয়েন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র কুমুদরঞ্জন লুহকেও কবি তাঁর সঙ্গে করিমগঞ্জ হইতে শ্রীহট্ট যাইতে আহ্বান করেন। করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন করিমগঞ্জ গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ভারতচন্দ্র চৌধুরী ও সহকারী প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ, জননায়ক সতীশচন্দ্র দেব, শ্রীশ্রীশচন্দ্র দত্ত, প্যারীচরণ নন্দী প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। অভিনন্দন পাঠ করেন ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ। কবি প্রত্যুত্তরে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন--পাশ্চাত্য হইতে কোন গৌরব যদি আমি ভারতবর্ষে বহন করিয়া আনিয়া থাকি--সেটা আমার একার নহে সেটা আমার দেশের গৌরব, জাতির গৌরব--প্রত্যেক ভারতবাসীর গৌরব।'

করিমগঞ্জের বিবরণ এখানেই শেষ, এরপর রয়েছে কুলাউড়া জংশনে কবির রাত্রিবাস, শ্রীহট্টে কবি-সংবর্ধনা ও সে সময়কার কবির উপস্থিতিতে দু'টি ঘরোয়া রঙ্গতামাশার বিবরণ।

কুমুদরঞ্জন কবির করিমগঞ্জ উপস্থিতির তারিখ বলেন নি, শুধু লিখেছেন-কার্ত্তিক মাস ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (১৯১৯)। আমাদের হিসেবে তারিখটা ছিল ৪ নভেম্বর, ১৯১৯। এর আগের রাতে কবি গুয়াহাটি ত্যাগ করেন, করিমগঞ্জ হয়ে শ্রীহট্টে পৌঁছেন ৫ নভেম্বর ১৯১৯ সকালে। কুমুদরঞ্জন লিখেছেন, 'করিমগঞ্জের জননেতৃগণ প্রত্যাগমনের পথে (শিলং > গুয়াহাটি > শ্রীহট্ট > আগরতলা > কলকাতা > বোলপুর) একদিন করিমগঞ্জে অবস্থানের জন্য কবিকে অনুরোধ করিয়া শিলং-এ পত্র দিলেন-কবি সময়াভাবের জন্য স্বভাবসুলভ বিনীত অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। স্থির হইল করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে করিমগঞ্জবাসী জনসাধারণের পক্ষ হইতে কবিকে সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইবে।'

কুমুদরঞ্জন সেই সঙ্গে লিখেছেন, 'তখন সুরমা মেইল মাত্র তিন মিনিটের জন্য করিমগঞ্জ স্টেশনে থামিত। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থায় সেই দিন সুরমা মেইল করিমগঞ্জে বিশ মিনিট অপেক্ষা করে।' কী করে এই অসাধ্য সাধিত হয়েছিল সেদিন, ব্রিটিশের রাজত্বে তিন মিনিটের জায়গায় বিশ মিনিট-- কোন সাহসে? কী সেই 'বিশেষ ব্যবস্থা'? সেই রহস্যেরও চাবি পাওয়া গেছে শিলচর গুরুচরণ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ রথীন্দ্রচন্দ্র দত্তর কাছে। উকিলপট্টিতে তাঁদের বাড়িতেই অনেক কথা হল নব্বই বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে--হেমচন্দ্র দত্ত, জ্যোৎস্না দত্ত, যূথিকা, কামিনীকুমার চন্দ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির নানা কথা। দেখলাম তিনি করিমগঞ্জ

রেলস্টেশনের ঘটনার বিষয়ে জানেন। মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, 'ব্রিটিশ আমলে তিন মিনিটের জায়গায়, তুমি যে বলছ বিশ মিনিট, না বিশ মিনিট নয়, প্রায় আধঘণ্টা ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখার হিম্মত ছিল কার? হ্যাঁ, কামিনীকুমার চন্দর। তিনি ছিলেন ভারতীয় রেলের কৌঁসুলি। ব্রিটিশরাও তাঁকে সমীহ করত।'

কুমুদরঞ্জনের আরও একটি কথা বিশদ করি, এরপর যাব অভিনন্দনপত্রের প্রসঙ্গে।

কুমুদরঞ্জন লিখেছেন, 'সম্বর্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন করিমগঞ্জ গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ভারতচন্দ্র চৌধুরী...।' এই সূত্রটিকে বিশদ করা দরকার।

ভারতচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবারিধি, রায় সাহেব (১৮৭৪-১৯৫৭), শ্রীহট্টের সুসন্তান, খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী। তাঁর পুত্র বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক ও ইতিহাসকার ভূদেব চৌধুরী। শান্তিনিকেতনে ভূদেববাবুর বাড়িতে একদিন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় ভূদেববাবু এক নাটকীয় সংযোগের সন্ধান দিলেন। ভারতচন্দ্র যখন কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, সারা বাংলা রচনা প্রতিযোগিতায় (বিষয়: প্রভাত সংগীত কাব্য-সমালোচনা) প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ভারতচন্দ্রের বিশ্লেষণ কবির প্রশংসা কুড়িয়েছিল। পতিসরের জমিদারিতে এসে পুরস্কার প্রাপক ছেলেটিকে দেখতে চাইলেন। রাজশাহিতে এক আঢ্যের বাড়িতে থাকেন ভারতচন্দ্র, ওখানে থেকেই পড়াশোনা করেন। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন ছাত্রটির দারিদ্র্যের কথা জেনে বি.এ. পরীক্ষা পাশের পূর্বপর্যন্ত পাঁচ টাকা করে মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কবি। করিমগঞ্জের সংবর্ধনাসভার কালে ভারতচন্দ্রের বয়স পঁয়তাল্লিশ, তখন তিনি সমাজে ও চাকুরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। পতিসরে কবির সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন তাঁর বয়স সতেরো। এই পুনর্মিলনে কিছুমাত্রায় হলেও এক নাটকীয় ঔজ্জ্বল্য ছিল।

ভূদেববাবুর সঙ্গে সেবারকার সাক্ষাৎকারের কয়েকমাস পর বিচিত্রাভবনে দুই বিশিষ্ট গবেষকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। একজন গোপালচন্দ্র রায়, অন্যজন বারিদবরণ ঘোষ। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল। পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গেই সোল্লাসে বারিদবরণ বলে ওঠেন, 'করিমগঞ্জের সংবর্ধনা সভার বিবরণটা দিন। দেশ বিদেশের সহস্র রবীন্দ্রসংবর্ধনা নিয়ে কাজ করছি। কিন্তু এমন সংবর্ধনা ইউনিক।' জানতে পারলাম প্রশান্তবাবুর কাছে অসমিয়া সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও আসাম বিষয়ক সিরিয়ালের যে কপি যেতো, তার থেকেই বারিদবাবু কথাটি জেনেছেন--আজ তাঁর এত উৎসাহ। সংবর্ধনাসভায় প্রদত্ত সম্মানপত্র অতঃপর আশাতীতভাবেই পেয়ে গেলাম বিশ্বভারতীতে, বিস্মিত আনন্দে মন দুলে উঠল। করিমগঞ্জ রেলস্টেশনের সেই কবেকার সংবর্ধনার নথি শান্তিনিকেতনে!

পুনশ্চ: 'কানেট চৌরি নিল অধরাতি' (চর্যা. ২)

নিবন্ধটি লিখেছি ২৮ মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। লেখা যখন মাঝপথে, দূরদর্শনের সংবাদ-পাঠকের একটা বাক্য এসে তিরের মতো বিঁধল। কী বিড়ম্বিত উত্তরাধিকার! বিস্মিত বেদনায় এরপর আবার শুনলাম--রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক চুরি গেছে বিশ্বভারতীর প্রদর্শশালা থেকে!

পরের দিন কাগজে কাগজে খবরের ফুলঝুরি। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির কেশরের মতো এখনও খবর নিত্যই ঝরছে। ঝরবেও।

ভাবি, চোরের ওপর রাগ করব কেন, করলেও ওঁর কিছু আসে যায়? 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি'। চোর বোলপুরেরই হোক, অথবা বলিভিয়ার---একই কথা। চোরের ধর্ম চুরি করা, থুড়ি, বলা উচিত, চুরি করেন বলেই তিনি চোর। গৃহস্থের প্রতিপক্ষ। নিজের নিজের জিনিস গৃহস্থ বাঁচাবেন, বলা বাহুল্য। যখন অন্যের সম্পত্তি, জাতির আমানত তাঁর কাছে থাকে, দায়িত্ব বেড়ে যায় শতগুণে। এ-যুগের 'স্বাধিকার প্রমত্ত'রা যক্ষের মতো নির্বাসিত হন না। গদিকে এঁরা ভালোবাসেন, গদি এঁদের ভালোবাসে। উন্নত সামাজিকদের অনুশোচনাহীন মোহাচ্ছন্নতা ম্লান করে দেয় অসামাজিক চোরের অপকর্মটিকেও।

১৯১৯-এর সংবর্ধনাসভায় সম্মানপত্রটি রবীন্দ্র-জীবনের ছোট্ট একটি পাপড়ি বটে, তবে বিরল রঙের। বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান এটি। এই দলিল খোয়া যায় নি, নিশ্চয়ই আছে যথাস্থানে, যথাপূর্বম্। অনেকে বলেছেন, কবির 'সম্পত্তি'র বেচাকেনার সম্ভাবনা নেই। কথাটা ঠিক নয়, বিশ্বজোড়া চোরাবাজারে এসবের দর যে বড় চড়া। কবিসম্মানের দলিল, কবির কীর্তি সহজেই চালান হতে পারে অন্তঃপুর থেকে অন্ধকারের হাটে।

নিরীহ গবেষকেরই হ্যাপা বেশি, আগামীতে ঘোমটাটা আরও লম্বা হবে মনে হচ্ছে। আসুন আপাতত আমরা প্রতিলিপিই দেখি।

কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীকরকমলে—

স্বাগত হে বিশ্ব-কবি!

এস হে বঙ্গবাণীর বরপুত্র! তোমার বীণার ঝঙ্কারে আজ বিশ্বজগৎ চমৎকৃত। তোমার প্রতিভায় আজ নিখিল ভারত জগৎসভায় গৌরবান্বিত। আজ আর তুমি শুধু বঙ্গের নও, শুধু ভারতের নও, আজ তুমি বিশ্বের কবি। তোমাকে বিশ্বের নামে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছি বলিয়াই আজ এত গর্ব্ব। ভারতীয় জ্ঞানের পরিচয় দিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানকৌলিন্যের আভিজাত্য-গৌরব ভঙ্গ করিবার যে মহিমাময় কীর্ত্তি অর্জন করিয়াছ, তাহাতে আজ দেশবাসীর মুখ উজ্জ্বল।

বাঙ্গলাদেশের এই প্রান্তভূমি আজ ভাষাজননীর সেবায় তেমন অগ্রসর না হইলেও চিরকাল এমন নীরব ছিল না। এই করিমগঞ্জ সহরের অনতিদূরে নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন রঘুনাথ শিরোমণির জন্মভূমি। প্রেমের বন্যায় যিনি বাঙ্গালার পাপরাশি ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন সেই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের পিতৃ পিতামহের পদাঙ্কিত পুণ্য ভূমি ঢাকাদক্ষিণ বহুদূর নহে। শ্রীহট্ট জিলার নানা ভূখণ্ড তাহারই পার্শ্বচর অদ্বৈতপ্রভু, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রভুপাদগণের পদরজানুরঞ্জিত বলিয়া গৌরবান্বিত। আজ তোমার শুভাগমনে শ্রীহট্টের সে গৌরব সেই প্রাণ ফিরিয়া আসুক। শ্রীহট্টের সেই কৃতি সন্তানগণের পুণ্যাশীর্ব্বাদে তোমার শুভাগমন সফল হউক।

প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীকে বর্তমানে উপযোগী করিয়া যে এই শব্দময় প্রাণহীন শিক্ষার সংস্কারের যে আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছ তাহা অচির-ভবিষ্যতে শিক্ষাবিজ্ঞানে এক নূতন যুগ আনয়ন করিবে। তোমার প্রতিষ্ঠান স্থায়ীত্ব লাভ করিয়া ভাবুকতা ও কার্য্যকুশলতার অভূতপূর্ব্ব সমন্বয়ের ইতিহাসের কীর্তিস্বরূপ জগতে বিরাজ করুক।

হে ঋষিপ্রতিম কর্ম্মি, হে জ্ঞানি, হে জগত বরেণ্য কবি!
শ্রীভগবান্ তোমাকে জয়যুক্ত ও দীর্ঘজীবী করুন।

করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩২৬ বাং

নিবেদক—
করিমগঞ্জ নগরের জনসাধারণ—

করিমগঞ্জ প্রেস্।

সুরমা-বরাক উপত্যকায় প্রাক-চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম: তাম্রলিপির আলোকে

সুজিৎ চৌধুরী

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃকুল ও মাতৃকুল দুই-ই শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপ গিয়েছিলেন, সেই সূত্রে তাঁর শ্রীহট্ট-সংস্রব নিয়ে সুরমা-বরাক উপত্যকাবাসীরা গর্ববোধ করেন। তবে তাঁর জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা সবই নবদ্বীপে। অতএব পরবর্তীকালে তিনি যে ধর্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাতে শ্রীহট্টীয় কোনো উত্তরাধিকার কার্যকর ছিল কি না, সে প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়। বস্তুত এ নিয়ে তেমন কোনো চর্চাও হয় নি। চৈতন্যদেব নবদ্বীপে ছাত্রজীবন শেষ করার পর পিতামহীকে দেখার জন্য ঢাকাদক্ষিণে এসেছিলেন, এ রকম কাহিনি চালু রয়েছে, তবে ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে নিঃসংশয় নন। তবে একটা কথা তো সত্য যে, চৈতন্যদেবের প্রবীণ ও নবীন পার্ষদদের অনেকেই ছিলেন শ্রীহট্টীয় এবং কোনো না কোনো ভাবে তাঁরা নিশ্চিতই সুরমা-বরাক উপত্যকার সমকালীন চিন্তাচেতনা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য, মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস পণ্ডিত, যদুনাথ কবিচন্দ্র, মাধব দাস প্রভৃতিকে নিয়ে তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। এঁদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য সবচাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। আর তিনিই চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের পটভূমি তৈরি করেছিলেন বললে বোধহয় ভুল বলা হয় না। ঐ সময়ে নবদ্বীপ ছিল তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্র, যেখানে বৈষ্ণব ঐতিহ্য খুব জোরদার ছিল না। তাই নবদ্বীপের প্রবাসী শ্রীহট্টীয়রা বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরাগী হওয়ার যে প্রবণতা দেখিয়েছিলেন, তার সঙ্গে তাঁদের আদি বাসভূমি অর্থাৎ সুরমা-বরাক উপত্যকার ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রভাবের একটা কার্যকর সংস্রব ছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। এই আলোচনায় আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে, চৈতন্যপূর্ব যুগের সুরমা-বরাক উপত্যকার ইতিহাসের তাম্রলিপিনির্ভর যেটুকু উপাদান আমাদের হাতে রয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে, বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতনার একটা প্রবাহ এই অঞ্চলে প্রায় সহস্র বৎসর ব্যাপীই বহমান ছিল। আর যে পার্ষদদের প্রাথমিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা চৈতন্যদেব লাভ করেছিলেন, তাঁদের মানসিক পরিমণ্ডলে আদি বাসভূমির সেই ধর্মীয় ঐতিহ্য কার্যকর ছিল।

সুরমা-বরাক উপত্যকার ইতিহাসের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে আমরা কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রলিপির উল্লেখ করতে পারি। এটা একটা ভূমিদান-লিপির নবীকরণ। আসলে ভাস্করবর্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্মা শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে বহিরাগত ব্রাহ্মণদের বসতি করিয়েছিলেন। সেই দানপত্রটা অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে সেই ব্রাহ্মণদের বংশধররা রাজস্ব দেওয়ার দায়ে পড়ে যান। তখন তাঁদের পক্ষ থেকে ঐ দানকে নূতন করে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভাস্করবর্মার কাছে আবেদন করা হয়, আর সেই আবেদন মঞ্জুর হয়। নবীকৃত সেই দানপত্রই নিধনপুর লিপি নামে পরিচিত। ২০৫জন ব্রাহ্মণের নামধাম

উৎকীর্ণ রয়েছে ঐ লিপিতে। একটি ফলক হারিয়ে গেছে, তাতে নিশ্চয়ই আরো কিছু নাম ছিল।

মৌর্যযুগ থেকেই রাজা বা শাসকরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন, তবে শতকরা নিরানব্বুই ভাগ ক্ষেত্রেই দান করা হত অকর্ষিত বা পতিত জমি। আশা করা হত যে ব্রাহ্মণরা স্থানীয় উপজাতীয়দের লাঙ্গলভিত্তিক কৃষিকাজ শিখিয়ে ঐ পতিত জমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করবে। কার্যত সেই কাজটা ব্রাহ্মণরা যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পাদন করতেন। কৃষির এই বিস্তারের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসারের একটা সম্পর্ক ছিল বলে অনুমান করা যায়। সুবীরা জয়সোয়াল তাঁর Origin and Development of Vaisnavism গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, নারায়ণ, কৃষ্ণ, বলরাম ও বিষ্ণুর উপাসনার মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মের যে বিচিত্র প্রকাশ মৌর্যযুগের শুরু থেকেই ধারাবাহিক ভাবেই চলছে, তার সঙ্গে লাঙ্গলভিত্তিক কৃষির সম্প্রসারণের সম্পর্ক ছিল। নিধনপুরের লিপির বিভিন্ন উপাদান আলোচনা করলে আমরা দেখব ঐ লিপিতেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের নিদর্শন রয়েছে।

লিপিতে আমরা পাচ্ছি যে, প্রদত্ত ভূমির এক সপ্তাংশ বরাদ্দ ছিল একটি বলিচরুসত্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য। অক্ষরিক অর্থ ধরলে 'বলি' বলতে বোঝায় দেববিগ্রহের নিকট নিবেদিত গন্ধচর্চিত পুষ্প ও ফলমূল আদি উপচার, 'চরু' বলতে বোঝায় দেবতার ভোগে নিবেদিত পা য়সান্ন, আর 'সত্র' হল যেখান থেকে অতিথি ও দরিদ্রের অন্ন বিতরণ করা হয়। সোজা কথায়, বলিচরুসত্রের উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দত্তভূমিতে একটি সমৃদ্ধ দেবালয় ছিল, রাজপ্রদত্ত ভূমি থেকে তার ব্যয় সংকুলান হত আর লিপিতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণদের কেউ কেউ ছিলেন ঐ মন্দিরের সেবায়েত। 'বলিচরুসত্র' কথাটা প্রাচীন লিপিমালায় সাধারণত বৈষ্ণব মন্দির সম্পর্কেই ব্যবহার করা হয়েছে। সেদিক থেকে নিধনপুর লিপি একটি বৈষ্ণব মন্দিরের অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করছে, এমন কথা বলা যেতে পারে।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের ঐ লিপিতে যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের নাম আমরা পাচ্ছি, তা থেকেও ধর্মীয় আবহের একটা ধারণা করা সম্ভব। কোনো ব্যক্তির নামকরণ যে অনিবার্যভাবে তাঁর ধর্মীয় আনুগত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, এমনটি নাও হতে পারে। তবুও নামকরণের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক প্রবণতার একটা লক্ষণ যে ধরা পড়ে, তা তো অনস্বীকার্য। সেদিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে, মোট ২০২টি নামের মধ্যে ৩২টি নাম বৈষ্ণব-প্রভাবিত। যেমন, মনোরথ স্বামী (সবগুলো নামই স্বামী অন্ত বিশিষ্ট, পরবর্তী নামগুলিতে ঐ সাধারণ অভিধা আর উল্লেখ করছি না), বিষ্ণু ঘোষ, নন্দ দেব, সঙ্কর্ষণ, নারায়ণ, বিষ্ণু, সুদর্শন, গোপেন্দ্র, মধু সেন, ধ্রুব সোম, বিষ্ণু সোম, বিষ্ণু পালিত, চক্র দেব, নারায়ণ কুণ্ডু, গোপাল নন্দী, বিষ্ণুভূতি, বিষ্ণুদত্ত, কৃষ্ণ, জনার্দন দেব, মধু মিত্র, মধুস্বামী, সনাতন, প্রদ্যুম্ন, নন্দেশ্বর, গোবর্ধন, সুদর্শন, নারায়ণবৃদ্ধি, গোপাল, নন্দভূতি, কেশব প্রভৃতি। ধর্মীয় অনুরক্তির ভিত্তিতে যদি নামগুলোর পরিসংখ্যান দেখি, তাহলে দেখা যাবে যে, বৈষ্ণব-প্রভাবিত নামের অধিকারীরা ছিলেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারপরে ছিলেন সৌরধর্ম প্রভাবিত নামধারীরা। তাঁদের সংখ্যা ছিল ২৪ জন।

প্রাসঙ্গিক আরেকটা তথ্যের কথা উল্লেখ করি। নিধনপুরের সন্নিকটে সুপাতলা গ্রামে মোগল রাজত্বের সময়ে একটি পুকুর খননের সময়ে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। পঞ্চখণ্ডের বাসুদেববাড়িতে ঐ মূর্তি তখন থেকেই পূজিত হচ্ছে, মোগল রাজত্বে ঐ দেবতার পূজার ব্যয়সংকুলানের জন্য ভূমিদানও করা হয়েছিল। কমলাকান্ত গুপ্তের মতে, ভূমিগর্ভ থেকে উদ্ধারীকৃত ঐ বিগ্রহই মূলত নিধনপুর লিপিতে যে বলিচরুসত্রের উল্লেখ রয়েছে, সেই দেবস্থানের অধিষ্ঠাতা দেবতার বিগ্রহ (Copper Plates of Sylhet, p.66)। ঐ অনুমানের যাথার্থ্য নির্ণয় সুকঠিন, তবে অন্য একটি তথ্যের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বঙ্গের পালবংশীয় সম্রাট ধর্মপালদেবের রাজত্বের সময়ে উৎকীর্ণ খালিমপুর তাম্রলিপিতে দেখা যায়, মহাসামন্ত নারায়ণবর্মা শুভস্থলী নামক স্থানে নারায়ণদেবের (নন্ননারায়ণ) একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন, আর লাটদেশ (গুজরাট) থেকে আগত ব্রহ্মণদের ঐ মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত করেছিলেন। অন্যত্র কমলাকান্ত গুপ্ত ('বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস', সম্পাদক আব্দুল আজিজ ও অন্য চারজন, পৃ. ২৩) অনুমান করেছেন যে, খালিমপুর লিপিতে প্রদত্ত যে ভূমি, তা পঞ্চখণ্ড সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এ সম্পর্কে বিস্তৃত কোনো আলোচনা কমলাকান্ত করেন নি, তাই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐ অনুমান সম্পর্কে আমরা স্থিরনিশ্চয় নই। আমাদের কাছে যে কথাটা প্রাসঙ্গিক তাহল খালিমপুর লিপিতে 'শুভস্থলী' নামক গ্রামনাম ও গুজরাটদেশীয় ব্রাহ্মণদের উল্লেখ। আগে বলেছি যে, পঞ্চখণ্ডের বাসুদেব মূর্তির প্রাপ্তিস্থান হচ্ছে সুপাতলা গ্রাম। এই 'সুপাতলা' কথাটি খুব সহজেই 'শুভস্থলী'র অপভ্রংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। আর পণ্ডিত সমাজের একটি বড় অংশের ধারণা যে, নিধনপুর লিপির ব্রাহ্মণরা এসেছিলেন গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চল থেকে। কমলাকান্ত গুপ্ত যে অনুমান করেছেন যে খালিমপুর লিপিতে প্রদত্তভূমি আর নিধনপুর লিপির প্রদত্ত ভূমি একই অঞ্চলে (পঞ্চখণ্ডে) ছিল, তা যদি মেনে নিই তাহলে 'শুভস্থলী' ও 'সুপাতলা'র মধ্যেকার ধ্বনিসাদৃশ্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা অবশ্য আরো তথ্য প্রমাণ না পেলে খালিমপুর লিপি সংক্রান্ত ঐ বক্তব্য গ্রহণ করতে পারছি না। কিন্তু এমন ভাবা নিশ্চিতই অযৌক্তিক হবে না যে, লাটদেশ বা গুজরাট থেকে যে ব্রাহ্মণরা লাঙ্গলভিত্তিক কৃষির অগ্রপথিক হিসাবে আসতেন, তাঁদের রীতিই ছিল নূতন দেবস্থান-কেন্দ্রিক জনপদকে 'শুভস্থলী' নামে আখ্যায়িত করা। আর সুপাতলা নামটি ও সেখানে প্রাপ্ত বাসুদেবমূর্তি সেই ঐতিহ্যেরই স্বাক্ষর বহন করছে।

নিধনপুর লিপির কাল হচ্ছে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ। তার কিছু দিন পরেকার, অর্থাৎ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগের একটি লিপি পাওয়া গেছে সিলেটের শ্রীমঙ্গলের নিকটবর্তী গ্রাম কালাপুরে। এটাও ভূমিদানলিপি, দাতা সামন্ত মরুণ্ড নাথ। কমলাকান্ত গুপ্ত এই মরুশুনাথের সঙ্গে আরেকজন সামন্ত নৃপতির সম্পর্ক অনুমান করেছেন। তিনি হচ্ছেন সামন্ত লোকনাথ। এই সামন্তের কথা আমরা পাই কুমিল্লায় প্রাপ্ত একটি তাম্রলিপিতে। কমলাকান্ত বলেছেন লোকনাথ ও মরুগুনাথ একই বংশের লোক ছিলেন, লোকনাথ সামান্য আগেকার। দুটো লিপিরই সিলমোহর একই ধরনের, গজলক্ষ্মীর মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে দুটোতেই। এই দুটো

লিপিকে একই সামন্তবংশের ধরলে সুরমা-বরাক উপত্যকার প্রাচীন ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য তার সবগুলো প্রাসঙ্গিক নয়। লোকনাথলিপির একটি প্রসঙ্গ আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লিপিতে রয়েছে যে, লোকনাথ জয়তুঙ্গবর্ষ নামক অঞ্চলের সুবঙ্গবিষয়ের অটবী অঞ্চলে অনন্তনারায়ণের একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। কোথায় ছিল এই জয়তুঙ্গবর্ষ আর সুবঙ্গবিষয়?

এই প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করেছেন রাজমোহন নাথ ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী। রাজমোহন নাথ (The Background of Assamese Culture, p80) বলেছেন যে শিলচর থেকে ১৪/১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে সুবঙ্গ (সুবং) বলে একটা জায়গা রয়েছে আর জায়গাটি সুবঙ্গনদীর তীরে। সুবং নদীটি বরখলার কাছে জাটিঙ্গা নদীতে গিয়ে পড়েছে। রাজমোহন নাথ বলছেন যে, জাটিঙ্গা নদীর তীরবর্তী বরখলা অঞ্চলই ছিল প্রাচীন জয়তুঙ্গবর্ষ। আর ঐ নামটি 'জাটিঙ্গা' শব্দেরই সংস্কৃত রূপায়ণ। আর সুবঙ্গ বিষয় আধুনিক সুবং অঞ্চলকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল। নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ১৩৫১ বঙ্গাব্দের 'শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'লৌহিত্য-পূর্ব ভূখণ্ডের প্রত্নৈশ্বর্য্য' নিবন্ধে জানাচ্ছেন, জাটিঙ্গা ভ্যালিই ছিল প্রাচীন জয়তুঙ্গবর্ষ আর সুবং বিষয় আধুনিক সুবং অঞ্চল নিয়েই গঠিত হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সপ্তম শতকের মধ্যভাগেই জাটিঙ্গা নদীর অববাহিকায় জনবসতি গড়ে তোলার অনুষঙ্গ হিসাবে অনন্তনারায়ণ বিষ্ণুর মন্দির স্থাপন করা হয়েছিল।

আগেই বলেছি যে, মরুগুনাথের তাম্রলিপিটি পাওয়া গেছে শ্রীমঙ্গলের কাছে কালাপুরে, পরগনার নাম চৌতলি। এটিও অনন্তনারায়ণের মন্দির। কিছু আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য থেকে কমলাকান্ত অনুমান করছেন যে, তাম্রলিপিটি যেখানে পাওয়া গেছে মন্দিরটিও সেখানেই ছিল। তিনি এও বলেছেন, হয়তো ঐ দেবস্থানের কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্য জায়গার নাম হয়েছিল চতুঃস্থলী, যা থেকে চৌতলি পরগনার নামটি এসেছে। ঐ লিপিতেও লোকনাথ-লিপির মতো 'অটবী ভূখণ্ডে'র মধ্যে মন্দির স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। বলা প্রয়োজন যে, কমলাকান্ত গুপ্ত নিধনপুর লিপির চন্দ্রপুর বিষয়ের যে সীমানা নিরূপণ করেছেন, জাটিঙ্গা ভ্যালি তো বটেই, শ্রীমঙ্গল অঞ্চলও সে সীমার বাইরে ছিল। এ-কথা বোধহয় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, চন্দ্রপুর বিষয় বলতে যে অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে, সেখানে ব্রাহ্মণ আগমন, বিষ্ণু মন্দির স্থাপন আর লাঙ্গলভিত্তিক কৃষির সূচনা হয়েছিল অন্তত ষষ্ঠ শতকের প্রথমে। জাটিঙ্গা বা শ্রীমঙ্গল অঞ্চলকে অটবী অঞ্চল বা বনভূমি বলা হয়েছে, সেখানে বন কেটে বসতের প্রয়াস শুরু হয়েছিল লোকনাথ মরুগুনাথের আমলে, অনন্তনারায়ণের দুটো মন্দির স্থাপনের মাধ্যমে।

এর পরবর্তী তিনশত বৎসরের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করতে পারে, এমন কোনো তাম্রলিপি সুরমা-বরাক উপত্যকায় পাওয়া যায়নি। খ্রিস্টীয় দশম শতকের গুরুত্বপূর্ণ একটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে মৌলবিবাজারের পশ্চিমভাগে। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর থেকে

বৌদ্ধরাজা শ্রীচন্দ্র এই লিপির মাধ্যমে ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে বসতি করিয়েছিলেন শ্রীহট্ট মণ্ডলের চন্দ্রপুর, গরলা ও পগারবিষয়ে। বিশাল একটি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের কথাও এই লিপিতে রয়েছে, যেখানে হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক জ্ঞানের চর্চা হত। দীনেশচন্দ্র সরকার বা নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এতবড়ো হিন্দু জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র পূর্বভারতে তো বটেই, গোটা দেশেই ছিল কি না সন্দেহ। বড়ো জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র যেগুলোর অস্তিত্ব দশম শতক পর্যন্ত ছিল, তার বাকি সবগুলোই ছিল বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। তবে সুবৃহৎ ঐ হিন্দু মঠের অধিষ্ঠাতা দেবতা হিসাবে যাঁদের পূজা হত, তাঁরা খুব জনপ্রিয় দেবতা হিসাবে পরবর্তীকালে পরিচিত হন নি। আবার এর আগেকার ঐতিহাসিক সাক্ষ্যও তাঁদের জনপ্রিয়তার কোনো প্রমাণ দিচ্ছে না। ঐ দেবতারা হচ্ছেন ব্রহ্মা, অগ্নি, যোগেশ্বর, জৈমনি ও মহাকাল। এর মধ্যে যোগেশ্বর হচ্ছেন শিব। তিনি জনপ্রিয় দেবতা, কিন্তু যোগেশ্বর রূপে নয়। জৈমিনি পূর্বমীমাংসা দর্শনের প্রবক্তা, তাঁর দেবত্বে উত্তরণের অন্য কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায় নি। অন্যরা পরিচিত দেবতা, কিন্তু তাঁদের ব্যাপক পূজার প্রচলন কোনো সময়েই ছিল না বলেই আমরা জানি। এতে মনে হয় যে, চন্দ্রপুর মঠের মাধ্যমে এই অঞ্চলে স্বল্প পরিচিত অন্যতর রূপের হিন্দুধর্মের চর্চা বেশ সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলছিল ও তা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও পেয়েছিল।

পশ্চিমভাগ লিপিতে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার সম্পর্কে অন্যতর কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে খুব কৌতূহলপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই ছয় সহস্র ব্রাহ্মণের আবাসনের ব্যবস্থাদি করে যিনি পুণ্য অর্জন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন কালীগ্রামনিবাসী বৈষ্ণব বিনায়ক। বিনায়কের 'বৈষ্ণব' বিশেষণ থেকে এটা বোঝা যায় যে ততদিনে এতদঞ্চলে বৈষ্ণবরা রীতিমতো একটি সম্প্রদায় হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর বিনায়ক নামধারী এই বৈষ্ণব যে ব্যক্তিগতভাবে পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তা তো পরিষ্কার হয়ে যায় যখন আমরা দেখি একটি মাত্র রাজকীয় দলিলের মাধ্যমে ছয়সহস্র ব্রাহ্মণের অভিবাসনের দায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

এর পরবর্তী দুটি তাম্রলিপি আমরা পাচ্ছি আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের। শ্রীহট্ট রাজ্যের অধিপতি কেশবদেব ও ঈশানদেব এই দুটি ভূমিদানের দলিল সম্পাদন করেছিলেন। এই রাজবংশ মূলত শৈব ছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক কালে যে ধর্মীয় উদারতা বর্তমান ছিল তাতে বৈষ্ণব প্রভাব ও শৈব প্রভাব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যেমন, গোবিন্দ কেশবদেবের পিতার নাম নারায়ণদেব। দুটো নামই বৈষ্ণব-প্রভাবিত। কেশবদেবের লিপিতে রয়েছে যে, তিনি ৩৭৫ ভূহল জমি দান করেছিলেন রাজ্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা বটেশ্বর শিবের মন্দিরের জন্য। আবার ঈশানদেবের লিপিতে রয়েছে যে, একই কেশবদেব কংসনিসূদন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের একটি সুউচ্চ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। রাজা ঈশানদেবও মধুকৈটভারি বা শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের জন্য জমিদান করেছিলেন।

বৈষ্ণব পুরাণের বহু কাহিনি যে এই অঞ্চলে বহুল প্রচারিত ছিল, তার সাক্ষ্য এই দুটি

লিপির মধ্যে রয়েছে। কংসনিসূদন ও মধুকৈটভারি বলে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে, অর্থাৎ দুটো কাহিনিই প্রচলিত। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর জন্মের উল্লেখ রয়েছে, উল্লেখ রয়েছে গোবর্ধন ধারণের, শিশুপাল বধের। রাধার উল্লেখ না থাকায় রাধার কাহিনি তখনো কৃষ্ণকথায় তেমন ব্যাপকভাবে যুক্ত হয় নি। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত বা হরিবংশে কৃষ্ণকথার যে রূপটি বর্তমান, তা পূর্ণমাত্রায়ই এই অঞ্চলে প্রচলিত।

এই আলোচনা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, খ্রিস্টীয় সপ্তমশতকে উৎকীর্ণ নিধনপুর লিপির সাক্ষ্য থেকে বৈষ্ণব ধর্মের বেশ জোরালো অবস্থানের যে প্রমাণ আমরা পাচ্ছি, পরবর্তী পাঁচশত বৎসরে তা আরো সংহতরূপ ধারণ করে। দ্বাদশ শতকের দুটি লিপিতে বৈষ্ণব চিন্তা চেতনাকে সুরমা-বরাক উপত্যকায় বেশ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রূপেই আমরা দেখতে পাই। প্রাক-চৈতন্য যুগের এই বিস্তৃত বৈষ্ণবীয় আবহ নিশ্চিতই নবদ্বীপের প্রবাসী শ্রীহট্টীয় সমাজ থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনুকূল পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।

মনসামঙ্গল কাব্যের এক অনালোচিত কবি রাধামাধব দত্ত

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় ধারা মনসামঙ্গল কাব্য। সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল। কাব্যের কাহিনি সর্বত্রই এক;-- পূজা আদায়ের জন্য চম্পক নগরের বণিক চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব। অঞ্চল বিশেষে কাহিনি বর্ণনায় কিছু ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে মনসামঙ্গল কাব্যকে তিনটি ধারায় ভাগ করা হয়েছে - পূর্ববঙ্গীয় ধারা, রাঢ়ের ধারা ও উত্তরবঙ্গীয় ধারা। মনসা পূজা প্রচলিত থাকার সূত্রে পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা -- হিন্দি, অসমিয়া ও রাভা ভাষায় একই কাহিনি অবলম্বনে মনসাকাব্য রচিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সন তারিখযুক্ত পুথি পাওয়া না গেলেও এ কথা বলা যায়, বঙ্গীয় ঐতিহ্যে মোটামুটিভাবে পঞ্চাদশ শতক থেকে মনসাকাব্য লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছিল। তারও আগে এ ধরনের গান নিশ্চিতভাবেই লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এই অনুমানের কারণ বঙ্গদেশ ও অসমে মনসার যেসব শিল্পসুষমা-মণ্ডিত মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলোর সময়কাল খ্রিঃ দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। প্রাপ্ত মূর্তি সমূহের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যা তৎকালীন সময়ে মনসাপূজার ব্যাপক জনপ্রিয়তার বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ। সূচনাপর্ব থেকেই মনসা পূজার সঙ্গে নাচ-গানের একটি সংযোগ ছিল। কারণ পূর্ব ভারতের সর্বত্রই মনসাকাব্য গেয় সাহিত্য। বরাক-সুরমা উপত্যকায় মনসামঙ্গ ল গানের তিনটি রীতি প্রচলিত। সমগ্র শ্রাবণ মাস জুড়ে মেয়েদের দ্বারা নির্দিষ্ট সুরে গীত মনসামঙ্গল গানে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয় রীতিতে নারী-পুরুষ একত্রে বসে সমবেত কণ্ঠে মনসামঙ্গল গান করেন। আর তৃতীয় রীতিটি এক ধরনের নাট্যিক উপস্থাপনা। একজন মূল গায়েন বিশেষ পোষাকে সজ্জিত হয়ে দুহাতে দুটি চামর নিয়ে গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে সমগ্র কাব্যটি উপস্থাপিত করেন। সঙ্গে থাকেন বায়েন। এই নৃত্যের নাম 'গুরমার গান' বা 'ওঝার গান'। 'গুরমা' ঔপভাষিক শব্দ। অর্থ, নপুংসক। একসময় কেবল নপুংসকরাই মনসামঙ্গল গান করতেন। মনসা পূজার অন্য একটি সংস্কারণ 'ডরাই বিষরি পূজায়' গুরমার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।'[১] অবশ্য এখন স্বাভাবিক নারী-পুরুষেরাই 'ওঝার গান' পরিবেশন করেন। মনসামঙ্গল গানের মূল বাদ্যযন্ত্রটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যন্ত্রটির প্রচলিত নাম 'পাখাজ'। 'পাখাজ' পাখোয়াজ শব্দের বিবর্তিত রূপ। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র দু'টির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। 'পাখাজ' মাটির তৈরী মৃদঙ্গের একটু বড় সংস্করণ। প্রস্থে মোটা, দৈর্ঘে মৃদঙ্গের চেয়ে খাটো। আর পাখোয়াজ কাঠের তৈরি। ... পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে ওঝা নাচের একান্ত প্রয়োজনীয় হল ত্রিশ হাত বা পনর গজ কাপড়ের সাদা ঘাগরী, গায়ে, হাতের কবজি পর্যন্ত ঢাকা লম্বা গোল-গলার সাধারণ ব্লাউজ, পাতলা ওড়না বা চাদর। সম্পূর্ণ ওড়নাখানার দৈর্ঘ্য তিন গজ বা ছয় হাত। দীর্ঘকেশা মেয়ে-ওঝার পিছন দিকে বৃত্তাকার খোঁপা (বর্তমানে যাকে 'ডোনাট' বলে) বাঁধা। বৃত্ত খোঁপার মাঝখানে খোঁপার অলংকার। কপালে হলুদ টিপ, কানে কুণ্ডল, হাতে হস্তপদ্ম, পায়ে চরণপদ্ম

তানপুর। হাত ও পা নানাভাবে চিত্রিত করা। বস্ত্র সমস্তই পাটসিল্কের বা সুতির হয়। অলংকারগুলি নিজের তৈরি এবং তা ওঝা নাচের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য। পুরুষ ওঝার বেশভূষা একই প্রকারের কেবল মাথায় খোঁপার বদলে বিশেষ এক ধরণের পাগড়ি।"[২] এই গানের পৃষ্ঠপোষক মূলত নিম্নবর্ণের সমাজ।

মনসামঙ্গল কাব্যের পূর্ববঙ্গীয় ধারার অন্তিম পর্যায়ের কবি রাধামাধব দত্ত। রাধামাধব দত্তের পুত্র রাধারমণ দত্ত বরাক-সুরমা উপত্যকার জনপ্রিয় গীতিকার। "ভাব ও সুর ছাড়াও রাধারমণের গানের আধ্যাত্মিক আকর্ষণ লোকজীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। প্রবীণপ্রবীণাগণ তাঁর গান গেয়ে সংকীর্তনে এখনও কৃষ্ণপ্রেমে কেঁদে আকুল হন। মনোহারী সুরে যখন গীত হয়-—'প্রাণসখীগো ঐ শোন কদম্বতলে বংশী বাজায় কে?' অথবা 'পার হইমু বলে মোর দিন তো যায় গইয়া' অথবা 'অকূলে ডুবিছি আমি বাঁচাও মোরে নিজ কৃপায়'- তখন ভাবের আতিশয্যে অনেকের চোখেই প্রেমাশ্রু পরিলক্ষিত হয়। রাধারমণের গান ছিল তাঁর সহজিয়া সাধনার অঙ্গ। তাঁর গীত রচনা তাঁর সাধক জীবনের অনিবার্য ফসল। তাই তাঁর গানে পৌরাণিক ও বৈষ্ণবীয় ভাবধারার স্রোত সম্মিলিত হয়ে রচনা করেছে এক আধ্যাত্মিক বলয়। প্রবীণরা যখন পরকালের চিন্তা করেন তখন রাধারমণের গানের বাণীতে তাঁরা তাঁদের মনের কথাই প্রতিধ্বনিত হতে দেখেন। এই প্রতিধ্বনি তাঁদের গৌরপ্রেমে বা কৃষ্ণপ্রেমে হাসায় ও কাঁদায়। বৈষ্ণব সহজিয়া ধারার সাধন রীতির লোকায়ত রূপ রাধারমণের গীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[৩] রাধারমণের সহস্রাধিক গান সংগৃহীত হয়েছে, একাধিক সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

রাধামাধব দত্ত রচিত মনসামঙ্গলকাব্যের নাম 'মনসা পাঁচালি'। রাধামাধব দত্ত সম্পূর্ণ মনসাকাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের দেবখণ্ড ও বানিয়াখণ্ড মাত্র পাওয়া গেছে। কালপ্রবাহে কাব্যের বাকি অংশ হারিয়ে গেছে। এই দুটি খণ্ডে যেমন মনসা পূজা সম্পর্কিত কিছু নূতন তথ্য আছে তেমনি আছে আঞ্চলিক সংস্কৃতির নানা উপাদান। তাই খণ্ডিত কাব্য হওয়া সত্ত্বেও 'মনসা পাঁচালি' আলোচনার দাবি রাখে।

রাধামাধব দত্ত রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের পুথি আমাদের হাতে এসেছে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের মাধ্যমে। রাধামাধব দত্ত-নারায়ণীয় তিন পুত্র রাধানাথ, রাধামোহন ও রাধারমণ। রাধারমণের তৃতীয় পুত্র বিপিনবিহারী বিবাহের পর শ্বশুরালয় ভুজবলে চলে যান। কেশবপুরে থেকে যান রাধামোহন-চন্দ্রমণির পুত্রত্রয় - রাসমোহন, সুরেন্দ্রমোহন ও রুক্মিণীমোহন। সুরেন্দ্রমোহন-মনোরমার চার সন্তান শ্যামাপদ, শান্তি, সবিতা ও নন্দিতা। শিলঙ নিবাসী সবিতা ও নন্দিতা পুথি দুটি বিপিনবিহারীর কন্যার দৌহিত্র কলকাতা নিবাসী দেবব্রত চৌধুরীর কাছে পাঠিয়ে দেন। দেবব্রত চৌধুরী ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের হাতে পুথিগুলো অর্পণ করেন।

রাধামাধব দত্তের পুথি দুটির পরিচিতি নিম্নরূপ :

১। মনসা মাহাত্য পদ্মপুরাণ। (দেবখণ্ড)। ভণিতায় নাম রাধামাধব দত্ত। মেশিনে তৈরি

কাগজে লেখা। ৪০×১৪ সেঃ মিঃ। সম্পূর্ণ পুথি। পত্র সংখ্যা ৩৮। ২-৩৯ পত্র। প্রথম পত্র ছিন্ন। প্রতি পত্রে ১২।১৩।১৪ লাইন। ৩১-৩৯ পত্রের হস্তাক্ষর আলাদা। পুষ্পিকাঃ ইতি মনসা মাহাত্য পদ্মপুরাণে সষ্ট অধ্যাএ দেবখণ্ড সমাপ্ত।

২। মনসা পাঁচালি (বানিয়া খণ্ড)। ভণিতায় নাম রাধামাধব দত্ত। কাগজে লেখা। ৪১ x ১৫ সেঃ মিঃ। সম্পূর্ণ পুথি। পত্র সংখ্যা ৫০। ১-৫০ পত্র। প্রতি পত্রে ৯/১০/১১/১২ লাইন। পুষ্পিকা নেই।

মনসামঙ্গল কাব্য শাখার একেবারে শেষ পর্যায়ের কবি রাধামাধবের রচনার আবেদন আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল। সম্ভবত এজন্যই বঙ্গীয় মনসা কাব্যের আলোচনায় রাধামাধব দত্তের নাম উল্লিখিত হয়নি। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'মনসাদেবীর ভাসান রচকগণ' শিরোনামে ৬২ জন কবির যে তালিকা সংকলিত হয়েছে, সেখানে রাধামাধব দত্তের নাম নেই। আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থেও রাধামাধব দত্তের নাম অনুল্লিখিত। 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার' ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (মাঘ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) 'পূর্ব্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবিগণ' নামে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশীদাস প্রমুখ ১৩ জন কবির কথা আছে। 'পূর্ববঙ্গের শেষ মনসামঙ্গলের কবি' হিসেবে তিনি ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার পুখরিয়া পরগণার ব্রজপুর নিবাসী গোপালচন্দ্র মজুমদারের নাম বলেছেন। গোপালচন্দ্র ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধের কবি। রাধামাধব দত্ত তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু উক্ত প্রবন্ধেও রাধামাধবের নাম নেই। বঙ্গীয় মনসাকাব্যের ধারায় রাধামাধব দত্ত অনালোচিত কবি।

দুই

'মনসা পাঁচালি' কাব্যে রাধামাধব দত্ত তাঁর আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন :

বঙ্গদেশের পুর্ব্বধারে সরমা নদীর পারে
রাজধানি শ্রীহট্য নগর।
তাতে দেশআত্বাজান কেসবপুর নামে গ্রাম
তাতে স্থিতি দত্ত প্রভাকর।।
দক্ষিণ রাড়িয় ধাম তাতে দেশ সপ্তগ্রাম
চক্রদত্ত বিক্ষ্যাত জগতে।
শেই বংশে প্রভাকর আত্মাজানে কৈলা ঘর
প্রকাশিত গৌতম গোত্রেতে।।
শেই বংশে কৃষ্ণরাম পুরকাস্থ্য ক্ষ্যাত নাম
তান সুত শ্রীরাধামাধব।

এই আত্মপরিচয় অনুযায়ী রাধামাধব দত্ত প্রবাদপ্রতিম আয়ুর্বেদ চিকিৎসক চক্রপাণি দত্ত-বংশজাত সন্তান। সপ্তগ্রাম নিবাসী চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ ছিলেন গৌড়াধিপতি নয়পালের মন্ত্রী। চক্রপাণি দত্ত ১০৫০ খ্রিঃ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'চক্রদত্ত' রচনা করেন। 'চক্রপাণি বংশ' গ্রন্থে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

সুশ্রুত চরক ভাষ্য রচিলা না করি লাস্য
অন্যগ্রন্থ চিকিৎসা-সার
শব্দ চন্দ্রিকা আখ্যানে খনিজদ্রব্য ব্যাখ্যানে
আয়ুর্বেদে তাঁর আবিষ্কার।।
চিকিৎসায় নবযুগ ভেষজে খনিজ যোগ
বলিহারি মহিমা অপার।
ধাতব ঔষধ ক্রিয়া নবরূপে প্রকাশিয়া
বিদ্যাবত্তা ঘোষে আপনার।।[৪]

কঠিন উদর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দের প্রাণ সংশয় দেখা দিলে ভিষগাচার্য চক্রপাণি দত্তকে শ্রীহট্টে আসার আহ্বান জানিয়ে দূত পাঠানো হল। কিন্তু বার্ধক্যজনিত কারণে ইষ্ট চিন্তায় রত বিষয়-নির্লিপ্ত এই চিকিৎসক সপ্তগ্রাম থেকে গঙ্গাহীন দেশ শ্রীহট্টে যেতে রাজি হলেন না। দূতের মুখে এই সংবাদ পেয়ে রানী তাঁর অঙ্গাভরণ উন্মোচন করে দূত মারফত চক্রপাণি দত্তের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে পিতা সম্বোধন করে জানালেন, ভিষগাচার্য না আসায় মহারাজের সুস্থ হবার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর অলংকারের প্রয়োজন নেই। তিনি স্বামীর অনুগমন করবেন। "তখন জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ বড় চিন্তিত হইলেন, 'যদি রাজার মৃত্যু হয়, তবে আমিই নারীবধের কারণ হইব।' দত্তবরের দয়া ও ধর্মভয় তাঁহার দৃঢ় সংকল্প ভাঙ্গিয়া দিল, তিনি যাইতে সত্বর প্রস্তুত হইলেন। এবং প্রাণাধিক পুত্রগণ সহ শ্রীহট্টে আসিলেন।"[৫]

চক্রপাণি দত্তের চিকিৎসায় দ্রুত আরোগ্য লাভ করে রাজা গৌড়গোবিন্দ বৃদ্ধ বৈদ্যকে শ্রীহট্টে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অনুনয় করতে লাগলেন। এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র মহীপতি ও মুকুন্দকে এদেশে রেখে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে চক্রপাণি দত্ত সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

মহীপতি দত্তের নবম অধস্তন পুরুষের নাম ছিল বামন। বামনের দুই পুত্র - কল্যাণ ও কন্দর্প। কল্যাণ তিন বিয়ে করেছিলেন। তাঁর পুত্রের সংখ্যা আঠারো। তাঁরা অনেকেই সে সময়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কল্যাণ দত্তের এক পুত্র "প্রভাকর শ্রীহট্টের আতুয়াজান পরগণায় বসতি করেন। সেই স্থান প্রভাকরপুর নামে খ্যাত হয়।... প্রভাকরের পৌত্র জগন্নাথের নামে জগন্নাথপুর মৌজার নামকরণ হয়। জগন্নাথপুরের সপ্তদশ শতকের রাজা বিজয় সিংহ জগন্নাথের পুত্র শম্ভুদাসের যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন্ত্রীপদ দান করেন। শম্ভুদাসের পুত্র কেশবদাস দত্তের নামেই হয়েছে কেশবপুর। কেশবপুরের দত্ত বংশ শ্রীহট্টে প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত।

রাধামাধব ও রাধারমণের মত কবি প্রতিভার জন্ম এই বংশে। পিতা-পুত্র এই যুগল কবি বাংলার গৌরব।"[৬]

কেশবপুরের দত্ত বংশজরা ছিলেন জগন্নাথপুরের রাজকর্মচারী। জগন্নাথপুরের অধিপতি বিজয় সিংহ নিহত হলে গৃহ বিবাদে 'রাজবংশীয়গণ দারিদ্র্যের চরম সীমায়' উপনীত হন। "জগন্নাথপুরের অধঃপতন সংঘটন হইলে, বিধিচক্রে রাজবংশীয়গণ দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের কর্মচারী, কেশবপুরের দত্ত বংশীয়গণ অন্য কাহারও দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা রাজ আশ্রিত ছিলেন, রাজার অবস্থা বিপর্যয়ে অন্যের দ্বারস্থ হইতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই,—তাঁহারা অনন্য চিত্তে সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়েই রাধামাধব দত্ত সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দের টীকা 'ভারত সাবিত্রী', 'ভ্রমরগীতা' রচনা করেন। তিনি মাতৃভাষার সেবাতেও অমনোযোগী ছিলেন না, বাঙ্গালা 'কৃষ্ণলীলা' গীতিকাব্য 'পদ্মপুরাণ' ও 'সূর্যব্রত পাঁচালী' তাহার পরিচায়ক।"[৭] এই বক্তব্যেরপাদটীকা অংশে অচ্যুতচরণ চৌধুরী লিখেছেন, রাধামাধবের 'এই গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক, কেশবপুরে কবির স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি আছে।'

তিন

'মনসা পাঁচালী'র দেবখণ্ড ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন দেব-দেবী বন্দনার পর রাধামাধব দত্ত সূত্রাকারে সমগ্র কাব্য কাহিনি বর্ণনা করেছেন এবং পূর্বসূরী সব কবিদের তাঁর সিদ্ধিদাতা বলে সম্বোধন করে নারায়ণ দেব ও ষষ্ঠীবর দত্তের নামোল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সৃষ্টি-কাহিনি। অনন্ত শয্যায় শায়িত নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি, ব্রহ্মার জগৎ সৃষ্টি, জীব সৃষ্টি, প্রজা সৃষ্টি ইত্যাদি পৌরাণিক আখ্যান এই অংশে ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসরণে বর্ণিত হয়েছে।

রাধামাধব দত্ত তৃতীয় অধ্যায়ে ভাগবতোক্ত দক্ষ ও শিব-সতী কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এই অংশটি নিছক পৌরাণিক বিবৃতি নয়, কবির বর্ণনাগুণে শিব, সতী ও নারদ মানবিক বৈশিষ্ট্যে ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে সতীর দেহত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে একান্ন পীঠের উদ্ভব কাহিনি। সম্ভবত লিপিকরের প্রমাদবশত পীঠমালার তালিকায় রামগিরি পর্বতের কথা বাদ পড়েছে। আবার দু একটি স্থান নামের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেছে।

মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের মতই রাধামাধব দত্ত শিব-পার্বতী বিবাহ বর্ণনায় দেব-চরিত্রের মানবায়ন ঘটিয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে 'ভাগবতীর জন্ম বিয়া' অংশে পৌরাণিক কাহিনির আবরণে পার্থিব জীবন-সংশ্লিষ্ট বিষয়ই স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয় পদ্মার জন্ম, পার্বতী-পদ্মার দ্বন্দ্ব, পদ্মার বিবাহ, জরৎকারু 'মুনি কর্তৃক পদ্মাকে পরিত্যাগ এবং পদ্মার লোকালোক পর্বতে গমন।

রাধামাধব অভিনব পদ্ধতিতে পদ্মার পিতৃপরিচয় উদঘাটিত হবার ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ছয় বৎসর বয়সে পদ্মা পাঠশালায় পড়তে গেলেন। একদিন হাতের কলম মাটিতে পড়ে গেলে তিনি সহপাঠীকে বললেন কলমটি তুলে দিতে। কিন্তু পিতৃপরিচয়হীনা কন্যাকে 'জারুয়া' (জারজ) আখ্যা দিয়ে সহপাঠী পদ্মার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। অপমানিতা পদ্মা তৎক্ষণাৎ বাড়ি রওয়ানা হলেন। পথে নারদের কাছ থেকে পিতার পরিচয় অবগত হলেন।

জবে পদ্যা ছএ সালে পাটগুরু স্থানে।
জবে পদ্যা ছএ সালে পাটগুরু স্থানে।
লেখীতে হস্তের খড়ি পড়িলেক ভুমে।।
হাসিয়া বলিলা দেবী পড়ুয়ার ঠাই।
খড়ি তুলি দেও মরে পড়ুয়ারে ভাই।।
পড়ুয়াএ বোলে তুমার বাপের ঠিক নাই।
জারুয়া জন্মিয়া কেনে এতেক বড়াই।।...
পড়ুয়াএ দিতে খুটা মনে দুক্ষি হৈলা।
পুথি বান্দি পদ্যাবতি গৃহেতে চলিলা।।
পথেতে নারদ সঙ্গে হৈল দরসন।
মুনি কহে পদ্যা কেনে বিরস বদন।।
পদ্যা কহে কহ মুনি কেবা মাতা পিতা।
শ্বরূপে কহত মুনি মর জন্ম কথা।।

কাব্যকে জন-মনোরঞ্জনী করার লক্ষ্যে লৌকিক রীতিকে প্রাধান্য দিলেও রাধামাধব দত্ত মনসা সম্পর্কিত পৌরাণিক উপাখ্যানকেও অনুসরণ করেছেন। পুরাণে মনসার জন্মের সঙ্গে শিবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সংযোগ নেই। যে কোন কারণেই হোক মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে শিবকন্যা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। রাধামাধব দত্ত মনসামঙ্গলের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মনসাকে শিব বীর্যজাতা কন্যা বললেও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও দেবী ভাগবতের অনুসরণে ঋষি কশ্যপের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। উপর্যুক্ত দুটি পুরাণে মনসা ঋষি কশ্যপের মন-জাতা কন্যা :

কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনেয়ং মনসাদেবী মনসা যা চ দীব্যতি।।

(প্রকৃতিখণ্ড।৪৫।২)

রাধামাধবের কাব্যেও কশ্যপ মুনি শিব বীর্য থেকে কন্যা সৃষ্টি করেছেন:

তবে চন্দ্র পদ্দনালে চলিল পাতালে।
নাগ রাজপুরে গেল জথাএ নিতলে।।

বাশুকি পাইয়া চন্দ্র কস্যপেতে দিলা।
ধ্যানেতে শিবের চন্দ্র কস্মপে জানিলা।।
পাইয়া শিবের চন্দ্র অতি হর্ষ মনে।
চন্দ্র হাতে লইয়া মুনি ভাবিলা তখনে।।
পুত্র আছে কন্যা নাই দেব ত্রিপুরারি।
বেদর্দ্ধনি করি ইতে হহিব কুমারি।।

তবে 'মনসা পাঁচালি'তে নাগলোকের অবস্থিতি নিতলে বলা হলেও পৌরাণিক বিবরণ অনুযায়ী নাগলোক মহাতলে।

অপরাপর মনসামঙ্গল কাব্যে কৈলাস পর্বত থেকে নির্বাসিতা পদ্মা সাঁতালি পর্বতে এসে নিজের রাজ্যপাট গড়ে তুলেছেন। কিন্তু 'মনসা পাঁচালি'তে পদ্মার নিবাস লোকালোক পর্বতে। ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণে লোকালোক পর্বতের বিবরণ আছে।

রাধামাধব দত্ত লিখেছেন :

মনসা মাহাত্য লোক সুন এক মনে।
কপিল জয়ে মুনি প্রশ্ন গড়ুর পুরানে।।

কিন্তু গরুড় পুরাণে মনসার কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য সর্প বিষ চিকিৎসা (পূর্বখণ্ড। ১৯ ও ২৭ অধ্যায়), গারুড়ী বিদ্যা (পূর্বখণ্ড। ২০৩ অধ্যায়) ইত্যাদির কথা এই পুরাণে আছে।

'মনসা পাঁচালি'র দেবখণ্ডে নতুন কিছু ইঙ্গিতও আছে। রাধামাধবের বর্ণনা অনুযায়ী মনসা 'স্থাব্য বিষে'র অধিকারিণী। সমুদ্র মন্থনজাত বিষের যে অংশ শিব পদ্মার জন্য বাসুকির কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন তা 'স্থাব্য বিষ'।

এক চোটি সর্প নাগে পাইলা কৌতুকে।
কত দিলা অস্ত্র মুকে জিবজন্তু নখে।।
এক চোটি স্থাব্য থৈলা বাশুকির স্থানে।
মর অংশে পদ্মা হবা তাহার কারণে।।

পদ্মার জন্মের পর বাসুকি সেই 'স্থাব্য' বিষের ভাণ্ডার তাঁর হাতে সমর্পণ করেছেন :

সঙ্করের অংশ পদ্যা উপস্থিত হৈলা।
জাত কর্ম্ম আদি কস্যপ কদ্রুএ করিলা।।
বাসুকিতে স্থাব্য বিশ দিলা পদ্যা স্থানে।
সম্বুরিলা বিস দেবী আপনার গুনে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী বিষ দ্বিবিধ — স্থাবর ও জঙ্গম।

অমৃতার্থং সমুদ্রে তু মধ্যমানে সুরাসুরৈঃ।
জজ্ঞে প্রাগমৃতোৎপত্তেঃ পুরুষো ঘোরদর্শনঃ ।।
দীপ্ততেজাশ্চতুর্দ্দংষ্ট্রে। হরিৎকেশোইনলেক্ষণঃ।

জগদ্ বিষণ্ণং তং দৃষ্টা তেনাসৌ বিষসংজ্ঞিতঃ।
জঙ্গমস্থাবরায়াং তদ্ যোনৌ ব্রহ্মান্যয়োজয়ৎ।।

('চরক সংহিতা' চিকিৎসা স্থান, ২৩ অধ্যায়)

"দেব ও অসুরগণ অমৃতলাভার্থ সমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অমৃতোৎপত্তির পূর্ব্বেই ঘোরদর্শন, দীপ্ততেজা, চতুর্দ্দণ্ডবিশিষ্ট, হরিৎকেশ, অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত, চক্ষুঃ বিশিষ্ট এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাকে অবলোকন করিয়া সমস্ত জগৎ বিষণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া সেই পুরুষ বিষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। ব্রহ্মা সেই জলজ বিষকে স্থাবর ও জঙ্গম যোনিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"[৮] বিবিধ 'প্রাণিসমূহের বিষ এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা দংষ্ট্রী প্রধান, তাহাদের

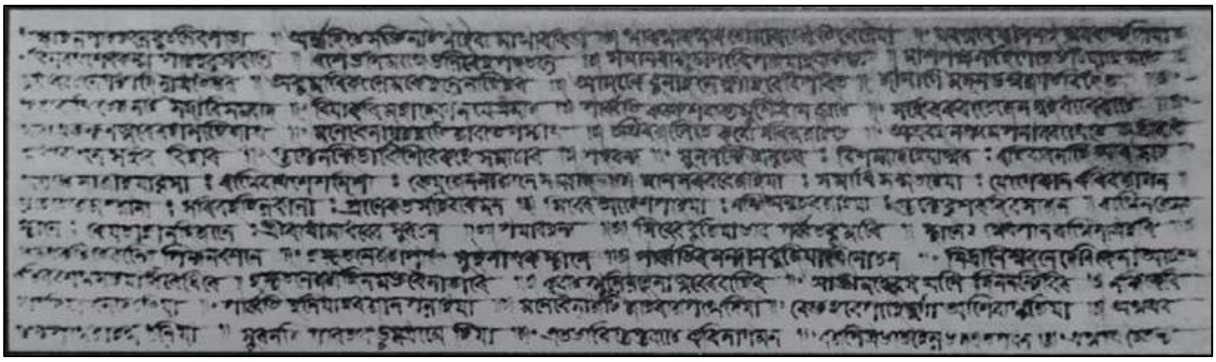

'মনসা পাঁচালি' পুথির দেবখণ্ডের একটি পৃষ্ঠা

দন্তোত্থিত বিষকে জঙ্গম বিষ বলা হয়।' মুতা, পুষ্করমূল ইত্যাদি দ্রব্য 'এবং এই প্রকার অন্যান্য দ্রব্যের মূল স্থাবর বিষ নামে অভিহিত।' অর্থাৎ প্রাণীজ বিষ মাত্রেই জঙ্গম বিষ আর উদ্ভিজ্জ বিষ হল স্থাবর বিষ। মনসার সর্পদেবী পরিচিতিতে অগ্রাধিকার দিলে তিনি জঙ্গম বিষের অধিকারিণী। 'মনসা পাঁচালি'র এই বিবরণ মনসার স্বরূপ উদঘাটনে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র।

বিষ প্রসঙ্গে অন্যতর একটি দিকও উল্লেখযোগ্য। 'মনসা পাঁচালি' কাব্যে মনসার বিষ দৃষ্টিতে প্রথম মৃত্যু (!) হয়েছে চাষি বছাইয়ের। বিজয় গুপ্তের কাব্যেও বছাই প্রসঙ্গ আছে। বৃদ্ধ শিবের সঙ্গে যুবতী পদ্মাকে যেতে দেখে বছাই তাঁকে বিবাহ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে ক্রুদ্ধ পদ্মার বিষদৃষ্টিতে সে ঢলে পড়ল। বছাইয়ের মা এসে কান্নাকাটি শুরু করলে পদ্মা বলেছেন :

পদ্যাবতি কহে বুড়ি চলি জায় ঘরে।
বছাইএ রাখিয়া পথে বিয়া করৌক মরে।।
পুত্রের বিবাহে মাএর সুখ হএ বড়।
জুকার মঙ্গলগিতে শিগ্রে গিয়া পুড়।।
বধুর সসুড়ি হৈতা কেনে ধর পাত্র।
বিবাহের সর্য্য আছে শ্রাদ্ধ হবে তাএ।।

সর্প দংশনে নিহত ব্যক্তির সৎকার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সর্পদষ্ট ব্যক্তির শব

কলার ভেলায় করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। অতি সাম্প্রতিককালেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখানে স্পষ্টতই অগ্নি সৎকারের কথা রয়েছে।

লক্ষণীয় অন্য দিকটি হল, আলোচ্য কাব্যে পদ্মা সর্পদেবী বা বিষনাশিনী দেবী রূপে নন, পূজিতা হবেন কল্পতরুদাতা রূপে।

ঝোতিশ গনিয়া কহে সকল দেবতা।
সংসারে পুজিত হবে কল্পতরূদাতা ।।

বানিয়া খণ্ড অনুযায়ী চাঁদ সওদাগরের পত্নীর নাম স্বর্ণরেখা। স্বর্ণরেখার তদ্ভব রূপ সনকা। 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী'তে স্বর্ণরেখা নামটি আছে, 'জরৎকারুমস্তিকঞ্চ মর্ত্যে চন্দ্রধরং তথা। স্বর্ণরেখাঞ্চ তৎপত্নীং পুত্রং লক্ষ্মীধরং তথা।'

ধন্বন্তরি কাহিনি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে মহাভারতের অক্ষত-বিষবৈদ্য আখ্যান, পরিক্ষিৎ দংশনে আগত অক্ষত বিষ নিষ্ক্রিয়করণে বৈদ্যের আশ্চর্য ক্ষমতা দর্শনে তাকে প্রভূত সম্পদ দান করে পরিক্ষিৎ-এর চিকিৎসাকর্ম থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। মহাভারতীয় এই কাহিনির পরবর্তী অংশ আছে স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে। ধনলোভে নীতিভ্রষ্ট হওয়ায় সেই বৈদ্য সর্বত্র নিন্দিত হতে লাগলেন। কোন গ্রামেই তার স্থান হল না। তখন কাশ্যপ নামক সেই ব্রাহ্মণ শাকল্য মুনির শরণ নিলে তিনি বললেন :

যোন রক্ষতি বিপ্রেন্দ্র বিষরোগাতুরং নরম্।
ব্রহ্মহা স সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।। (৪১। ৭০)

"হে বিপ্রেন্দ্র! যে ব্যক্তি বিষ রোগাতুর নরকে ক্রোধে, কামে, ভয়ে, লোভে, মাৎসর্যে, কিম্বা মোহে পড়িয়া রক্ষা না করে, তাহাকেই ব্রহ্মহা, সুরাপায়ী, স্তেয়ী, গুরুতল্পগামী ও সংসর্গ দোষে দোষী বলিয়া নির্দেশ করা হয়।"

বৈদ্যের অনুসরণীয় নীতির কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা মুমূষোর্মানবস্য হি।।
তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ।
ইতি প্রাহুঃ পুরা শ্লোকং ভিষবৈদ্যাব্ধিপারগাঃ।। (৪১। ৭৮-৭৯)

"যে পর্যন্ত মুমূর্ষু মানবের প্রাণ কণ্ঠগত না হয়, সেই পর্যন্ত তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য। কেন না, কালের গতি কুটিলা। হয়ত বা তাহাতে বাঁচিবারও সম্ভাবনা। চিকিৎসাশাস্ত্রসাগরের পারগামী পণ্ডিতগণ পূর্বে এইরূপই শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন।"

শেষ পর্যন্ত শাকল্য মুনির অনুগ্রহে সেই বৈদ্য নিন্দাবাদ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। মহাভারতীয় কাহিনির এই ধারাবাহিকতা তক্ষক-দংশন ঘটনাটির নবতর বিশ্লেষণের সহায়ক।

কালিদহে চাঁদ সওদাগরের ডিঙা রক্ষা করার জন্য চণ্ডী ক্ষেত্রপালকে আহ্বান করেছেন।

ক্ষেত্রপাল ডাকি আজ্ঞা কৈলা ভগবতি।।
সুন ক্ষেত্রপাল তরা সমুদ্রে পড়িয়া।

কাণ্ডারে বসিছি আমি ডিঙ্গা জায় লইয়া।।
ব্যত্যাএ করিতে ভর ডিঙ্গা ফিরে পাকে।
জলে পড়ি ক্ষেত্রপালে পৃষ্ট দিয়া রাখে।।

"ক্ষেত্রপালের প্রাচীনত্বের ও প্রাধান্যের বিষয় অনুমান করা যায়, বৌদ্ধযুগে, মহাযানী বৌদ্ধরা বাঙলা দেশের যে কয়েকটি বিখ্যাত লৌকিক দেবতাকে তাঁদের দেবকুলভুক্ত করেছিল সেগুলির মধ্যে ক্ষেত্রপালের উল্লেখ দেখা যায়।...

"... উত্তরবঙ্গে দু একটি জেলায়, চট্টগ্রামে এঁর পূজাপার্বণ সমারোহের সঙ্গে হয়। চট্টগ্রামেই এঁর আজও কিছু প্রাধান্য আছে। এ জেলার মাহিরাগ্রামের ক্ষেত্রপাল বিখ্যাত, বার্ষিক পূজা বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।"[১০] লিঙ্গপুরাণে ক্ষেত্রপাল শিবের অবতার। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও ডাকিনীতন্ত্রে এঁর উল্লেখ আছে। একটি ধ্যানে ক্ষেত্রপাল শিবের পুত্র, বিকৃত আনন, ত্রিলোচন, জটাকপালধারী, দিগম্বর, ভুজঙ্গভূষণ, উগ্রদর্শন, কেশ পিঙ্গলবর্ণ, ত্রিশূল, ডমরু ও খট্টাঙ্গধারী।[১১] 'মনসা পাঁচালি' অনুযায়ী গণেশের ছিন্নমুণ্ড থেকে দ্বাদশ ক্ষেত্রপাল উদ্ভূত হয়েছিলেন। পার্বতীর সঙ্গে ক্ষেত্রপালের এই সম্পর্কসূত্র, পূর্ববঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ক্ষেত্রপালের জনপ্রিয়তা এবং তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত শিবসন্তান পরিচিতির সুবাদে চণ্ডী ক্ষেত্রপালকে আহ্বান করেছেন।

চার

রাধামাধব দত্তের কাব্যে নানা প্রসঙ্গে সমাজ জীবনের কিছু কথা আছে। তবে এ থেকে সমকালীন সমাজের কোন সুসংবদ্ধ পরিচয় পাওয়া যায় না। কাব্যের প্রয়োজনে তথ্যগুলি এসেছে বিক্ষিপ্তভাবে।

দেবখণ্ডে শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবন বর্ণনায় পূর্বসূরীদের মতই রাধামাধবের কাব্যেও মানব জীবন সম্পৃক্ত নানা প্রসঙ্গ এসেছে। সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিতা দক্ষের যজ্ঞে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে শিব বলেছেন :

সসুর বাড়িতে জদি গৌরব না থাকে।
তবে জে গমন করা মরন অধিকে।।

দুই সতীনের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক থাকে না এ কথারও অবতারণা করেছেন রাধামাধব।

এ বড় প্রমাদে দেবি পড়িলা এখনে।
সতিনালা বড় জালা সহিবা কেমনে।।
সতিনে সতিনে পৃত কথা এক ঘরে।
দুই নারির এক পতি দন্দ নাহি ছাড়ে।।

উল্লিখিত হয়েছে বহু বিবাহজনিত সমস্যার কথাও:

দিবারাত্রি ভেদ নাই সদা বিসম্বাদ।

বিয়া করি মহাদেব গনয়ে প্রমাদ।।
পার্ব্বতি কর্কশ বাক্য সুনি প্রান ফাটে।
সঙ্কের করাতে জেন দুইধারে কাটে।।

ডোমিনী সংসর্গের পরিণতি বর্ণনায় নিম্নবিত্তের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ইঙ্গিত রয়েছে :

রাজার নন্দিনি তেজিয়া ডুমুনি
অবে কি অভাব আর।
চড়াইয়া গাল বাওাইব জাল
বত্তাব মাছের ভার।।
বানাইয়া বেগারি নিব বাড়ি বাড়ি
শিদল বেচিবার তবে।
করিয়া বাজার আনিব শুশার
তোমি বশি খাইবা ঘরে।।

শিব-পার্বতীর বিবাহে নারীদের গীত-উলু, দধিমঙ্গল, সপ্তপ্রদক্ষিণ, প্রতি প্রদক্ষিণের পর স্বামীর উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান (কুচি-উড়ানি), শুভদৃষ্টি বাসিবিবাহ এসবই বরাক-সুরমা উপত্যকার বিবাহ আচার। বানিয়া খণ্ডেও অনুরূপ আচারই অনুসৃত হয়েছে।

লখিন্দরের বিবাহ উপলক্ষে নানা বৃত্তিজীবী মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। বৃত্তিভেদে প্রত্যেকের উপাধি ছিল আলাদা।

পাত্র মিত্র সঙ্গে সাধু মন্ত্রনা করিয়া।
বির্ত্তিকর সব ডাকি দিল নিজজিয়া।।
দধি দিতে গোয়ালের প্রতি ভার দিল।
বারই সকলে গোয়া পানের ভার নিল।।
তেলিরে করিল আজ্ঞা তেল জুগাইবার।
ফুলমালিগন আইলা মালা গাথিবার।।
চিড়ার ফরমাইশ নিলা সকল সুতারে।
গ্রামে গ্রামে তণ্ডুল আশিল ভারে ভারে।।
তাতি সবে দিতে হৈল বস্ত্র জত লাগে।
ভূইমালি আসিয়া মসালের বস্ত্র মাগে।।
কুমার সকলে দিলা মৃতিকা ভাজন।
খাদ্য বস্তু আনি দিলা বেপারিয়াগন।।
নট ভাট বাজিকর দেশে জত ছিল।
বার্তা জানি চান্দের বাড়িতে সব আইল।।

সমাজ ব্রাহ্মণদের কী চোখে দেখত তা বিধৃত হয়েছে তক্ষক-ধন্বন্তরি আখ্যানে। ব্রাহ্মণদের

জীবনচর্যাকে ব্যঙ্গ করে ধন্বন্তরি বলেছেন :

ব্রাহ্মনে ব্রাম্মনে জদি দেখা হৈল পথে।
জিজ্ঞাশা করিবা আগে দক্ষিণা কথাতে।।
শে বলে দক্ষিণা কালি হবে শেই স্থানে।
তোমি কিছু সুনি থাক কহ মর স্থানে।।
পরস্পরে বার্তা জানি দুহে জাইবা ঘর।
এক এক জনে দিবা বার্তা দুই চাইর নগর।
দক্ষিণার পূর্ব্ব দিনে বাড়িতে না খাইবা।
চলিলে দক্ষিণার দিনে ফিরিয়া না চাইবা।।
প্রহরে দিনেক জাবা করি পরিশ্রম।
সুদ্র বাড়ি শ্রাদ্ধ পাইলে দধি চিড়ার যম।।
পাতার উপরে পাতা বান্দি বৈশ পিড়া।
একজন খাইতে লৈবা তিনজনের চিড়া।।
মিত্তা বাক্যে একে লইবা দুই তিনের কৌড়ি।
রাত্র যদি রৈতে পার নষ্ট কৈলা বাড়ি।।

লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য ওঝাদের খাতির থাকলেও তাদের লোক ঠকানোর প্রবণতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যে অবহিত ছিল তা বোঝা যায় তক্ষকের উক্তিতে :

বেজ বৃত্তি করিয়া খায় জ্ঞান নাই গুটী।
বৈদ্য সাশত্র দুই এক পুথি পড়িয়া ফটফটি।।
লইয়া ঔসদের কড়ি দিবা জড়মড়।
রোগির মরণ দেখী ভাগিয়া দেও লড়।।
নাড়ি ধরি চক্ষু বুজ জান বা না জান।
থাকে বা না থাকে রোগ টানিয়া কিছু আন।।
সর্প গলে বান্দি ভিক্ষা মাগ ঘরে ঘর।
স্ত্রি লোক ঠগিতে বুদ্ধি জানহ বিস্তর।।

দেবখণ্ডের অনুরূপ বানিয়াখণ্ডেও লখিন্দরের বিবাহ বর্ণনা আঞ্চলিক আচার সম্মত। বরাক-সুরমা উপত্যকায় মেয়েলি গীত ও নৃত্য (ধামাইল) বিবাহের আবশ্যিক অঙ্গ।

সুনুকায় সঙ্গে লইয়া রমনি সকল।
নানান প্রকারে করে মঙ্গল গায়ন।।
নবিন জৌবনিগনে তালে করি ভর।
হস্ত লাড়ি নির্ত্ত করে অতি মনহর।।

বিবাহের পূর্বদিন অধিবাস, অধিবাসের রাত্রি জাগরণ করে ভোরবেলা বর-কনের কপালে মাঙ্গ

লিক টিকা পড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর মুষ্টিমেয় কয়েকজন আত্মীয়া পাশের কোন জলাশয়ে বর ও কনের নামে দুটি প্রজ্বলিত প্রদীপ ভাসিয়ে দেন। লোকবিশ্বাস হল, প্রদীপ দুটি যদি পাশাপাশি ভাসতে থাকে তাহলে বর কনের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। এরপর ওই আত্মীয়ারাই মাঙ্গলিক স্নানের জন্য সেই জলাশয় থেকে কলসি দিয়ে জল নিয়ে আসেন। এই আচারের নাম 'চুরপানি ভরা'। সনকা পরিজনদের নিয়ে এই আচারটিও পালন করেছেন।

ব্রাহ্মনে করিল শান্তি বেদমন্ত্র পড়ি।
সমুখেতে পুর্ন ঘট আম্রপত্রে পুরি।।
গনেশ সরিয়া দ্বিজে আগে টিকা দিলা।
তারপরে জ্ঞাতিবর্গ কুটুম্বে করিলা।।
তবে অভিশেক করি সব নারিগনে।
রজনির শেশে কৈলা গঙ্গার বন্দনে।।

বিবাহ অনুষ্ঠানে মেয়েদেরই প্রাধান্য। বর ও বরযাত্রীদের হেনস্তা করা বহু প্রচলিত প্রথা। বরযাত্রীদের রাস্তা আটকে মেয়েরা চাহিদা মত পান মিষ্টি আদায় করে নেয়। এক্ষেত্রে পরিচিত অপরিচিতের কোন বালাই নেই। অত্যাচার নয়, আনন্দের অঙ্গ হিসেবেই সমাজ এ ধরনের আচরণকে মেনে নিয়েছে। চাঁদ সওদাগর খুশি মনেই এই মেয়েলি আবদার সহ্য করেছেন।

বেকবিয়া নারিগণে গীত গায় পতে।
সুনি চান্দ সদাগর জিজ্ঞাসে তাহাতে।।
তারা বলে আমার দেসের বেবহার।
না দিলে বেকবিয়ার গোয়া নারে জাইবার।।
হাসী ২ কহে কথা চান্দ সদাগরে।
পাচবিসি গোয়া দেও বেকবি নারীরে।।

শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছার পর বস্ত্র, অলংকার, আভরণ দিয়ে বরকে বরণ করা হয়। প্রদত্ত বস্ত্র অলংকারে সজ্জিত হবার পর শাশুড়ি পর্দার আড়ালে থেকে জামাতার বাম হাতের অনামিকায় 'সোনা-রূপার আংটি' পরিয়ে দেন। এই বরণ অনুষ্ঠানের নাম 'দধিমঙ্গল'। এসব দেশাচারই পালিত হয়েছে লখিন্দরের বিবাহে।

বিবাহের খাটে বসাইলা লখিন্দর।
বরন সামগ্রি দিল সাহের সদাগর।।
কনক অঙ্গুরি জৈজ্ঞ মানিক্য জড়িত।
বরের সাক্ষাতে দিলা বস্ত্র সহিত।।
দ্বিজ সবে কৈলা সান্তি বেদমন্ত্র পড়ি।
দধিমঙ্গলে আইলা রত্না পাটেশ্বরি।।
মৈধ্যে বস্ত্র টানি দধি দেয় জামাইর করে।

কুদালে কাটিলা জত মৃতিকাতে পড়ে।।

বিবাহের দিন ক্ষৌরকর্মের পর ক্ষৌরকার বর ও কনের হাতে তুলে দেন 'ধুত্রা কাটাইল'। কুঁড়ি অবস্থায় থাকা কলাগাছের মাঝখানের পাতার অগ্রভাগ, ডালিম গাছের কুঁড়ি, ধুতুরা পাতার কুঁড়ি প্রতিটি সাতটি করে একত্রে বেঁধে তৈরি করা হয় 'ধুত্রা কাটাইল।' সঙ্গে থাকে পিতলের দর্পণ। কুঞ্জের অভ্যন্তরে সাতপাকের সময় ষষ্ঠ প্রদক্ষিণ পূর্ণ হলে বর কনের দর্পণ বদল করা হয়। এই দেশাচারেরও উল্লেখ করেছেন রাধামাধব দত্ত।

সুভ লগ্নে কৈন্যা বরে হৈল সুভ দেখা।
আরম্বিল প্রদক্ষীন মুখচন্দ্রিকা।।
নাপিতে ধরিল ছত্র বিপ্রে বেদ পড়ে।
চারিদিগে সর্ব্বলোকে হরি হরি শ্বরে।।
দর্পন বদল ধর্ম্ম কৈল ছয় পাকে।
মাথার উপরে পদ্যা সর্পগনে ডাকে।।

পরদিন 'বাসি বিয়া' সম্পন্ন হবার পর বর কনেকে নিয়ে রওয়ানা হন নিজের বাড়ি :

বেবহার জে আছিল হৈল বাসবিয়া।
জামাই চলিতে বার্তা চরে দিল গীয়া।।
চল ২ সব্দ হৈল চন্দ্রধরে।
বিপ্রে আসি জাত্রা করায় বিপুলা লখাইরে।।

বর-ঠকানো বিয়ের একটি অঙ্গ। শ্বশুরবাড়িতে সতর্কতা অবলম্বন না করলে যে কোন মুহূর্তে হাস্যাস্পদ হবার সম্ভাবনা। এ সম্পর্কে পুত্রকে সতর্ক করেছেন সনকা স্বয়ং।

আর এক বলি সুন অবধান কর।
ভুজন করিতে জাইবা সসুরের ঘর।।
বিনে নিরিক্ষনে না খাইবা কদাচিত্ত।
অনিতি দেখীলে লোকে বলয় কুচ্ছিত।।
কুলে না লইবা স্যালা স্যালকি জে জত।
সমন্দিকের বধুরে না দিবা দণ্ডবত।।

নতুন বরকে খাওয়ানোর জন্য (জামাই খানি) বিশেষ পদের উল্লেখ আছে :

প্রথমে রান্দিল রামা নানান অম্বল।
পাসান পাত্রেতে রাখে হৈথে সিতল।।
নানা জাতি ঘণ্ট রান্দে নানান প্রকার।
মানকচু কাচকলা বার্তকি অপার।।
দস বিস বেঞ্জন রান্দিল ঝালে ঝুলে।
নিরামিস ঘণ্ট কৈল বার্ত্তকি পটলে।।

আটীয়া গাছের মাইজ কুলাণ্ডের বরি।
ঘৃতে সিক্ত করি রান্দে বিস্তর তরকারি।।...
তৈল দিয়া ভাজিলেক চিতলের কুর।
সরিস মিসালে রান্দে কাচকলার ঝুল।।

বরাক-সুরমা উপত্যকায় সিদল একটি জনপ্রিয় খাদ্য। বাঙ্গাল দেশের লোকেরা যে সিহুলী বা শুকনো মাছ খেতে ভালবাসে, এ কথার উল্লেখ আছে সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব' গ্রন্থে। আঞ্চলিক এই খাদ্যবস্তুটির প্রশংসায় উক্ত অঞ্চলবাসীরা পঞ্চমুখ। 'মনসা পাঁচালি'র কবি রাধামাধব দত্ত চাঁদ সওদাগরের বদল-বাণিজ্য উপলক্ষে সিদল মাহাত্ম্যও বর্ণনা করেছেন :

সুনিয়া সিদলের কথা রাজা হরসিত।
কিবা শে উত্তম নিধি আনি আছ মিত্র।।...
নগরে পড়িল সাড়া আসিছে সিদল।
ঘ্রানে মগ্ন হৈলা লোক সকল পাগল।।
সিদল খাইয়া রাজা হৈলা হরসিত।
চান্দের গলায়ে ধরে আইস প্রান মিত্র।।
জেমত অপূর্ব্ব নিধি খাবাইলে মিতা।
ই জন্মে তোমার ধার সুজিবাম কথা।।

শ্রীহট্ট ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয় ১৭৬৫ খ্রিঃ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শ্রীহট্টের অর্থনীতিতে বাণিজ্যের একটি ভূমিকা ছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে শ্রীহট্ট ছিল নৌবাণিজ্যের একটি কেন্দ্র। এই ঐতিহ্য সূত্রেই শ্রীহট্টের প্রথম ইংরেজ কালেক্টর রবার্ট লিন্ডসে '১৭৮২-৮৩ ইং সনে সামুদ্রিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শ্রীহট্টের শিল্পীদ্বারা কয়েকখানি অর্ণবপোত নির্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন। ১১২ রাধামাধব দত্তের কাব্য রচনার সময় ইংরেজ অধিগ্রহণের পরবর্তীকাল। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য পথের বিবরণ আধুনিক ভূগোলসম্মত। তবে 'মান্দ্রাজ নগর' এর পর 'গুজরাট নগর' এর উল্লেখ সংশয়ের সৃষ্টি করে। পূর্ব উপকূলে গুজরাট নামে কোন সামুদ্রিক বন্দর নেই। উল্লেখ্য যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনের বর্ণনা আছে। স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণীত হলে মঙ্গল কাব্যের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার সহায়ক হবে।

বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করতে হলে কী করণীয় দুলাইয়ের জবানিতে এর উল্লেখ আছে।

জেমত প্রকারে নরে হস্থিয়ে হস্থি বন্দি করে
তেমত কড়িতে বন্দি কড়ি।।
উত্তম বেপারি জানি পুঞি মূল্যে দৈব্য কিনি
নায়ে ভরি দেসান্তের জায়ে।
এক লাভে বিক্রি ধরে আর দব্য চয় করে
তাহলে লাভের লাভ পাত্র।।

গৃহ নির্মাণ প্রক্রিয়ার কথা আছে লৌহবাসর গড়ার বিবরণে।

প্রথমে গড়িয়া পুস্থা খাম কৈল খাড়া।
নব কুটা করি ঘরে বশাইল বেড়া।।
তাহার উপরে ঘর চৌআরি তোলিল।
উপরেতে চাইর চালে হাটনি বান্দিল।।

খুব স্বল্প পরিসরে নারীর সামাজিক অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন রাধামাধব। বাণিজ্য যাত্রার প্রাক্কালে সওদাগরকে গর্ভপত্র লিখে দেবার অনুরোধ জানিয়ে গর্ভবতী সনকা বলেছেন :

নারির জীবন জান বড়ই সংসয়ে।
অল্প ছিদ্র পাইলে লোকে মন্দ বড় কয়।।
পুরূস ভ্রমর জাতি মনে নহি থাকে।
গৃহে আসি পুত্র দেখী দুস দিবা মকে।।

সন্তানহারা মায়ের সদা শঙ্কিত মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে লখিন্দরের বিবাহ প্রসঙ্গে সনকার উক্তিতে।

ছয় পুত্র খাইল নাগে উঝা ধনন্তরি।
বিসানলে তোমার বাগয়ান গেল পুড়ি।।
শে সব সরিয়া প্রভু পুড়ে হিয়া মর।
সব দুক্ষ পাসরিছি দেখী লখীন্দর।।
ক্ষেমা কর প্রাণনাথ কি হবে বিয়াএ।
সবে এক পুত্র য়াছে তাহ হারাইবায়।।

পাঁচ

রাধামাধব দত্ত প্রশংসনীয় সৃজনী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কাব্যনির্মাণকলায় তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিল। গ্রন্থ সূচনায় কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'কবিতা কমল অতি/নানা ভাসা নানাবিধ ছন্দ'। কোমল কাব্যদেহকে অলঙ্কৃত করার জন্য তিনি ছন্দ-নির্মিতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। বাণী ভঙ্গিমায় ভারতচন্দ্রকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর এই মহত্তম কবি প্রতিভার অনুরূপ দক্ষতা তাঁর ছিল না।

তবে ছন্দ-নির্মাণকলায় রাধামাধবের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ৮ + ৮ + ১০ মাত্রার ত্রিপদীর পাশাপাশি তিনি পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী ৬ + ৬ + ৮ মাত্রার ত্রিপদীও ব্যবহার করেছেন। এই রীতির ত্রিপদীকে তিনি, আলাদাভাবে 'ছোট ত্রিপদী' নামে চিহ্নিত করেছেন। যেমন,--

সুন সুনপানি / তেজিয়া রমনি /
ডুমুনির শনে ভাব। //

আইশ বলি তপে / কামিনি আরপে /
ডুমুনি হৈয়াছে লাভ।। //

কাব্যে ব্যবহৃত অন্য এক ধরনের ত্রিপদীর নাম 'মধ্যভঙ্গ ত্রিপদী'।

রাধামাধবের কাব্যে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের নাম 'পয়ার/চতুরক্ষরি মিল ছন্দ'। মনসামঙ্গ ল কাব্যধারায় বিজয় গুপ্ত 'মনসার জন্ম পালায়' শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রাধামাধব যেরকম ছন্দটিকে আলাদা নামে নামাঙ্কিত করেছেন, শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের সেরকম কোন নাম মধ্যযুগীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় নি। এই ছন্দ ব্যবহারে রাধামাধব পারদর্শী ছিলেন, বর্ণিত অংশে কোথাও কোন ছন্দ পতন ঘটেনি। যেমন,—

দেখী বর / বির্দ্ধ হর / নারি নর/ হাশে। //
জামাই বেটা / কেনে লেংটা / নাই ঘুমটা / কিশে ।। //
জে বিকট / মাথে জট / ফনি ফট / তাএ। //
ঘড়ি ঘড়ি / নাড়ে দাড়ি/ ফিরি ফিরি / চাএ ।। //

সংগীতশাস্ত্রেও রাধামাধবের দখল ছিল। উপভোগ্য কাব্য রচনা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এজন্য 'পটমঞ্জরি', 'ভাটিয়ল', 'বিলাবল' ইত্যাদি পরিশীলিত সাংগীতিক ঘরানার পাশাপাশি 'রাগ হরিলুট', 'রাগ কবি' ইত্যাদি লৌকিক রাগও ব্যবহার করেছেন।

ছয়

রাধামাধব দত্তের 'মনসা পাঁচালি'তে আছে :

কলিতে গহারি শেবে পঞ্চ জজ্ঞ ফল লাভে
চতুর্ব্বগ আদি ধন জন।

আবার বানিয়া খণ্ডেও 'গহারি পূজা'কে কলিকালে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিকল্প বলে চিহ্নিত করা হয়েছে :

কলিকালে অশ্বমেদ আদি জজ্ঞ নয়ে।
শেই ফল পাইব জেই গহারি পুজয়ে।।

মনসা পূজা তথা মনসামঙ্গল কাব্যের স্বরূপ নির্ধারণে এই 'গহারিপূজা' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' নামক একটি মনসা পূজাবিধির পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথিশালায় সংরক্ষিত আছে। পুথিটির সূচক সংখ্যা কে-৫৩১.১। বিদ্যাপতির রচিত এই পুথিটির আলোচনা প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ বলেছেন, "এই রচনার কবি-প্রদত্ত নাম 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গি নী।' এটি সংস্কৃতে রচিত একটি স্মৃতি বিষয়ক সংকলন গ্রন্থ। 'ব্যাড়' শব্দটি সংস্কৃত 'ব্যাল' শব্দের বিকৃতিজাত। 'ব্যাল' অর্থ সর্প, হিংস্র পশু, দুষ্ট, অনিষ্টকারী। 'ব্যাড়ী' স্ত্রী লিঙ্গের রূপ—

মনসাকেই 'ব্যাড়ী' বলা হয়েছে। অবশ্য গ্রন্থ মধ্যে সর্প দেবতাকে মনসা, বিষহরি ও সুরসা কলমেও অভিহিত করেছেন কবি। এই গ্রন্থে কবি বিভিন্ন স্মৃতি ও পুরাণোক্ত বিধান এবং গৌড়-মিথিলায় প্রচলিত মনসার লৌকিক পূজা পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন।[১৩]

সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুজিত চৌধুরী প্রমুখ পুথিটি নিয়ে পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন।[১৪] 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী'তে সমারোহপূর্ণ মনসা পূজার বিধান বর্ণিত হয়েছে।

লক্ষ্মীধরেণ নৌর্দত্তা যস্মান্মধুকরাভিধা।
তস্মান্মনোরমাং নাবং কৃত্বা তত্র প্রপূজয়েৎ।।
মৃণ্ময়ীং প্রতিমাং কৃত্বা দেবতাদ্যৈঃ সমাবৃতাং।
ঘট্টয়িত্বা বিচিত্রাঞ্চ পূজয়েদ্ গীতনর্তনৈঃ ।...
সন্নিধৌ ভূতনাথস্য বিপুলায়াশ্চ নর্তনে।
যে সমাগতাঃ দ্রষ্টং তাংস্তু তৎস্থান প্রপূজয়েৎ।।
ব্রহ্মাণং মাধবং রুদ্রং বাণীং লক্ষ্মীঞ্চ পার্বতীম্।
কার্তিকেয়ং গণেশঞ্চ কালীয়ং পন্নগাষ্টকং।
জরৎকারুমস্তিকঞ্চ মর্ত্যে চন্দ্রধরং তথা।
স্বর্ণরেখাঞ্চ তৎপত্নীং পুত্রং লক্ষ্মীধরং তথা।
তৎপত্নীং বিপুলাঞ্চাপি শ্রীধরাখ্যং দ্বিজং তথা।
যশোধরঞ্চ দৈবজ্ঞং কর্ণধারঞ্চ দুর্লভম্।
অগ্রে গণেশং নৌকায়াঃ পত্তীনষ্টৌ মনোহরান।
ভাণ্ডারিংশ্চাস্ত্রধরান্ মধ্যেহগ্রে মূলকে তথা।
লেখ্যাং রজকীঞ্চৈব সুগন্ধাঞ্চ তথাপরাম্।
সুরেশ্বরীং তথা দুর্গাং দেবীং দিক্ষু সমস্ততঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ সায়ুধাংশ্চ স্ববাহনান্।

"লক্ষ্মীধর যেহেতু মধুকর নামে একটি নৌকা দিয়েছিল, সেজন্য নৌকা নির্মাণ করে তাতে পূজার ব্যবস্থা ক'রবে। সমস্ত দেবতা পরিবৃত মৃন্ময়ী প্রতিমা তৈরী করে তাকে বিচিত্ররূপ দিয়ে নৃত্যগীত সহকারে পূজা করবে।... ভূতনাথের সম্মুখে বেহুলার নৃত্যে উহা দেখতে যারা সমাগত হয়েছেন তাঁদেরও সেখানে পূজা করবে। ব্রহ্মা, মাধব, রুদ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ, কালীয়, অষ্টনাগ, জরৎকারু, অস্তিক মর্ত্যে চন্দ্রধর, তৎপত্নী স্বর্ণরেখা, তৎপুত্র লক্ষ্মীধর, তৎপত্নী বিপুলা, দ্বিজ শ্রীধর, দৈবজ্ঞ যশোধর, দুর্লভ কর্ণধারকে পূজা করতে হবে। অগ্রে গণেশ এবং নৌকার অষ্টমনোহর পত্তিকে (মাল্লাকে) এবং অস্ত্রধর ভাণ্ডারীকে মধ্যে, অগ্রে ও মূলে পূজা করবে। লেখ্যা, রজকী, সুগন্ধা, সুরেশ্বরী, দুর্গা এবং চতুর্দিকস্থ দেবতাদেরকে পূজা করবে। আয়ুধ (অস্ত্র) এবং বাহনসহ ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালদেরকে পূজা ও হোম দ্বারা দ্বিজগণ

অর্চনা করবে।” [১৫]

এই বর্ণনায় মূল দেবী মনসা। মনসার এ ধরনের মূর্তি তৈরি করে পূজার রীতি বরাক-সুরমা উপত্যকায় জনপ্রিয় ছিল। “মনসা সর্পভয়-দায়িনী হইলেও তিনি ধনদায়িনীও বটেন। ধনলাভের কামনায় ধনী ব্যক্তি অনেকেই পূর্ব্বে সাড়ম্বরে মনসার পূজা করিতেন। এই সকল পূজার আড়ম্বর দর্শনীয় বস্তু ছিল। এই পূজার কথা প্রাচীন স্মৃতিতে জাগরুক আছে। এইরূপ পূজাকে নৌকা বা গোহারী পূজা বলে।” [১৬] বরাক উপত্যকায় এখনও গোহারি পূজা বা

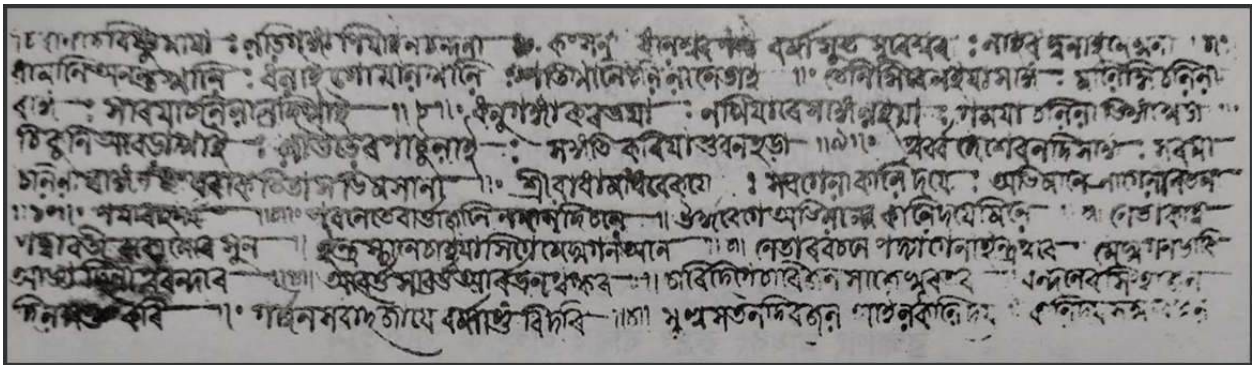

‘মনসা পাঁচালি’ পুথির বানিয়া খণ্ডের একটি পৃষ্ঠা

নৌকাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কাছাড় জেলা গেজেটিয়ারে এই পূজার বিবরণ আছে: “A special form of religious ceremony is known as the noaka or boat puja, and is performed by a wealthy man in satisfaction of a vow, who generally spends from Rs. 300 to Rs. 500 on the ceremony. A shed is built, at the end of which is a boat painted and gilt, from which rise tier upon tier, the images of various Gods, amongst whom Bishahari is generally the most prominent. For several days sacrifices are offered to the deities, and Brahmans, who are well paid and feasted for their services, offer up their prayers. At the end of this time the house and its contents are abandoned and allowed to fall to pieces.” [১৭]

নৌকার ওপর দেবদেবী ও মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্র সমাবৃত এই বিশাল মূর্তির নাম ‘গোহারি’। ‘ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী’তে এই নামের কথা আছে। ‘দর্শনাচ্চ বিচিত্রায়া বাগ্ দৃষ্টি হরণং ভবেৎ। নাগানাম্নাচ গৌহারী বিখ্যাতা সা মহীতলে।’ অর্থাৎ যেহেতু এই অপূর্ব চিত্র/মূর্তি দর্শন বাক ও দৃষ্টি হরণ করে সেজন্য এই নৌকা পৃথিবীতে গোহারি নামে খ্যাতা।

‘অমরকোষ’ অভিধানে গো শব্দের অনেকগুলি অর্থের মধ্যে বাক্ ও নেত্রও রয়েছে। কালিদাসের ‘রঘুবংশ’ ও মাঘের ‘শিশুপাল বধ’-এ গো শব্দটি বাক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

(রঘুবংশ) ‘ইত্যাপাত্রানুমিতব্যয়স্য রঘোরুদারামপি গাং নিশম্য।’ (৫।১২)

মল্লিনাথ 'গাং' (গো শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন) শব্দের অর্থ করেছেন 'বাচম্'।
(শিশুপাল বধ) 'বিহগাঃ কদম্বসুরভাবিহ গাঃ কলয়ন্ত্যনুক্ষণমনেকলয়ম্।' (৪।৩৬)
গাঃ (গো শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন) শব্দের মল্লিনাথ কৃত অর্থ হল 'বাচঃ। শব্দান্ ইত্যর্থঃ।'

উল্লেখ্য যে 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের' অন্তর্গত যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালায় দুটি 'গোহারি বিষহরি পূজাবিধি' পুথি রয়েছে। পুথি দুটির পরিচিতি নিম্নরূপ।

(ক) সূচক সংখ্যা ১১৫৬। সম্পূর্ণ। তুলট কাগজে লেখা। ৩৮০৮.৫ সেঃমিঃ। পত্র সংখ্যা ২৫। প্রতি পত্রে ৬ লাইন। শব্দ সংখ্যা ৪৫।৫০। তারিখ নেই। লিপিকর সদানন্দ শর্মা।

(খ) সূচক সংখ্যা ২৪৬৭। অসম্পূর্ণ। মেশিনে তৈরি কাগজে লেখা। ২৭০৭.৫ সেঃমিঃ। পত্র সংখ্যা ১। ৬ লাইন। শব্দ সংখ্যা ৪২। তারিখ নেই। লিপিকরের নাম নেই। [১৮]

বরাক উপত্যকায়ও অন্তত দুটি 'গোহারি বিষহরি পূজাবিধি' পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে। অল্প বিস্তর পাঠভেদ থাকলেও পুথিগুলোতে একই পূজা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন ভট্টচার্য সংগৃহীত ১১৫৬ সংখ্যক পুথিতে মনসাদেবীর গোহারি নাম প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে- 'যতো দেব্যার্দ্ধতোনুনং বজ্র মহাপদঃ। অতো বিষহরীদেবী গোহারীতি প্রকীর্ত্তিতা।' বরাক উপত্যকায় প্রাপ্ত পূজাবিধিতেও একই রকমের কথা আছে। এর অর্থ 'যেহেতু দেবী কর্তৃক বজ্ররূপ মহাআপদ হৃত হয় অতএব বিষহরি দেবী গোহারি নামে খ্যাতা।'

নৌকার উপরে অজস্র মূর্তি সমন্বিত মনসাপূজার ইঙ্গিত মনসামঙ্গল কাব্যেই আছে। প্রচুর টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত বেহুলার মধ্যস্থতায় চাঁদ সওদাগর একটি শর্তে মনসার পূজা করতে রাজি হলেন। শর্তটি হল, সওদাগরের 'চৌদ্দ ডিঙ্গা' চম্পক নগরের নদীর ঘাট থেকে সরাসরি তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। শর্ত অনুযায়ী মনসা নাগদের সাহায্যে ডাঙার ওপর দিয়ে ডিঙা চালিয়ে চাঁদ সওদাগরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। মনসার এই আশ্চর্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে সওদাগর সেই নৌকার (বহিত্র) ওপর মনসাকে স্থাপন করে অর্চনা করেছিলেন।

যদি সে জগাতী দিলেন আরতি
চলে চারিশত অহি।
বহিত্র লইয়া পৃষ্ঠে বসাইয়া
চাঁদের বাটীতে বহি।।
চাঁদ ভাগ্যবান ডিঙ্গা চৌদ্দখান
নাগেতে বহিয়া দিল।
উল্লসিত হৈয়া পুত্র বধু লৈয়া
নিজ ঘরে বসাইল।।
জালি ধূপ ধুনা বিয়াল্লিশ বাজনা
বহিত্র অর্চনা করে।

মঙ্গল শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন শুনি
দেবী সুপ্রসন্ন তারে।। [১৯]

এই বহিত্র অর্চনাই 'নৌকা পূজা' বা 'গোহারি বিষহরি পূজা'।

উল্লেখপঞ্জি

১ Sujit Choudhury, 'The Eunuch Priesthood and Deity Darai: A Case Study', Soumen Sen (Ed.), Folklore in North East India, New Delhi, 1985, pp. 137-145.

২ মুকুন্দদাস ভট্টচার্য, 'কাছাড় জেলার ওঝা নাচ', দেশ, ৭মার্চ, ১৯৬৪, পৃ. ৪৫৯

৩ নন্দলাল শর্মা, রাধারমণ গীতিমালা বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২ পৃ. ১৭-১৮

৪ উপেন্দ্র নাথ দত্ত, চক্রপাণি বংশ, শ্রীহট্ট, ১৩৪৬, পৃ. ৩২

৫ অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পরিমার্জিত উৎস সংস্করণ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৭

৬ সুনির্মল দত্ত চৌধুরী, গঙ্গা থেকে সুরমা, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৮২

৭ অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৮

৮ কবিরাজ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ (সম্পা), চরক সংহিতা, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ ১৯৬৬, পৃ. ১১

৯ আনন্দবাজার পত্রিকা, 'সর্পদষ্ট বালকের স্বর্গযাত্রা কলার ভেলায়', ৬ ডিসেম্বর, ২০০২, শহর সং

১০ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাঙলার লৌকিক দেবতা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ১৯৬৯ পৃ. ১৭৮

১১ অমলকুমার বন্দোপাধ্যায়, পৌরাণিকা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৪২৭

১২ ভারতচন্দ্র চৌধুরী, 'শ্রীহট্টে নির্মিত অর্ণবপোত', শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃ. ৩৫

১৩ আহমদ শরীফ, 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বিরচিত', ইতিহাস, ঢাকা, ১৩৭৫, পৃ. ১৫

১৪ (ক) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) প্রথম আনন্দ সং, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৯২-১৯৩

(খ) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, ষষ্ঠ সং, এ. মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ২৯৭-৩০২

(গ) সুজিৎ চৌধুরী, 'বিদ্যাপতির ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৮৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ. ২১-২৫

১৫ আহমদ শরীফ, 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বিরচিত', পৃ. ১৮৭-১৮৮

১৬ তারাপদ ভট্টাচার্য, 'মনসামঙ্গল', তন্ময় ভট্টাচার্য (সম্পা.), হারানো ভাবনার পুনরুদ্ধার, শিলচর, ১৪০৭, পৃ. ৬

১৭ B. C. Allen, Cachar District Gazetteer, Shillong, 1905, p.56.

১৮ Dr. Jatindra Mohan Bhattacharjee, A Descriptive Catalouge of the Sanskrit Manuscripts in the Collections of the National Council of Education, Bengal, Calcutta, 1993 pp. 57, 119.

১৯ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, মনসামঙ্গল (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ), সাহিত্য আকাদেমি, নয়াদিল্লি, ১৯৭৭, পৃ. ১১০

বরাক-সুরমা উপত্যকার স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত

আনন্দমোহন মোহন্ত

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ অধ্যয়নে স্মৃতিশাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং প্রাচীন ভারতের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি জানতে হলে স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা অপরিহার্য। স্মৃতিশাস্ত্র কী এবং কী করে তার উদ্ভব হল, এ-প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক।

বৈদিক কর্মকাণ্ড যখন বিশাল আকার ধারণ করল, তখন এর সংক্ষিপ্তসারের প্রয়োজনে সৃষ্টি হল কল্পসূত্র। কল্পসূত্রের তিনটি ভাগ শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম। ধর্মসূত্রে সমাজ ও জীবনের আচার, ব্যবহার এবং দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের প্রথম বিধান করা হয়েছে। এগুলি সূত্রাকারে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে গ্রথিত হওয়ায় সর্বসাধারণের দুর্বোধ্য ছিল। সেজন্য পরবর্তীকালে ধর্মসূত্রগুলি শ্লোকাকারে জনগণের বোধগম্য করে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্কা সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে। সুতরাং ধর্মসূত্রকেই ধর্মশাস্ত্রের অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রের উৎস বলা হয়।

বেদকে বলা হয় শ্রুতি। আর মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের প্রণীত ধর্মশাস্ত্রকে বলা হয় স্মৃতি। মনু বলেন, 'শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ'।[১] স্মৃতির মধ্যে অনুষ্ঠেয় ধর্ম-অনুশাসন নিবদ্ধ আছে বলে এই শাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্রও বলে। শ্রুতি-স্মৃতির অনুশাসন মেনেই আর্যসংস্কৃতি স্মরণাতীত কাল থেকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুদের দশ কর্ম স্মৃতির নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'নিষেকাদিশ্মশানান্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া।'[২] অর্থাৎ সমাজ ও জীবনের ধর্মীয় কর্তব্যাকর্তব্য ঋষিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত।

স্মৃতির বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়-আচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার। আচারাংশে চতুর্বর্ণের জীবনের এমন কোন দিক নেই যা স্মৃতিশাস্ত্রে আলোচিত হয়নি। প্রায়শ্চিত্তাংশে পাপের স্বরূপ উৎপত্তির কারণ, নরকোৎপাদিকা ও ব্যবহার বিরোধিকা এই শক্তিদ্বয়ের বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। ব্যবহারাংশে মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিভাগ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ের বিধান দেওয়া হয়েছে। স্মৃতির ব্যবহারাংশ যথার্থই প্রাচীন আইন। এই আইন-কানুনের সঙ্গে বর্তমানের Civil Procedure-এর সাদৃশ্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

উদ্ভবের লগ্ন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বহমান ধারায় বিভিন্ন ঋষিদের চিন্তা-ভাবনায় ধর্মশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়েছে। যুগের উপযোগী করে ধর্মশাস্ত্রকে অনুসরণীয় করার লক্ষ্যে অঞ্চল ভেদে কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধনও হয়েছে। সেই সব কিছু নিয়ে ধর্মশাস্ত্রকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে (১) সূত্রযুগ (২) সংহিতা যুগ ও (৩) নিবন্ধ যুগ। সামাজিক জীবনচর্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধান অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলেই ধর্মশাস্ত্রের প্রথম যুগ সূত্রযুগ নামে চিহ্নিত।

সংহিতাযুগে ধর্মসূত্রকেই ছন্দোবদ্ধ করে বিভিন্ন সংহিতা রচিত হয়। যেমন, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, পরাশর সংহিতা, কাত্যায়ন সংহিতা, হারীত সংহিতা ইত্যাদি কুড়িটি মুখ্য সংহিতা। এগুলির মধ্যে মনুসংহিতার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। বলা হয়, মনুসংহিতার সঙ্গে যে স্মৃতির বিরোধ সেই স্মৃতি আদরণীয় হয় না।

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্য হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশাস্যতে।।[৩]

ধর্মশাস্ত্রের সর্বশেষ যুগ নিবন্ধ ও ভাষ্যের যুগ। 'মলমাস তত্ত্বে' রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'নিবন্ধান্ বহুধালোক্য নিবধ্যন্তে সতাং মুদে'। অর্থাৎ নানা প্রাচীন গ্রন্থ পর্যালোচনা করে নানা স্মৃতির মত একত্র সংকলিত হয়েছে নিবন্ধ সাহিত্যে। সময়ের ধারায় সমাজ-মানসের যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সেই সময়ের রীতি-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নিবন্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, গৌড়ীয় স্মৃতি বা স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের নব্যস্মৃতি, মৈথিল স্মৃতি, কাশী স্মৃতি, উড়িষ্যা স্মৃতি, কামরূপ স্মৃতি, দাক্ষিণাত্য স্মৃতি ইত্যাদি।

স্মৃতি-সাহিত্যের তিনটি যুগের মধ্যে সূত্রযুগ ও সংহিতাযুগকে প্রাচীন স্মৃতির যুগ বলা হয়। আর নিবন্ধযুগে জীমূতবাহন, ভবদেব ভট্ট, অনিরুদ্ধ ভট্ট, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি স্মৃতিকারদের রচিত নিবন্ধগুলিও প্রাচীন স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত। নিবন্ধকারগণ প্রাচীন স্মৃতিতে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের বিধানই প্রমাণরূপে উপস্থাপন করে নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করেছেন, পরমত খণ্ডন করেননি। কিন্তু যে সময় থেকে যুক্তি-তর্ক, প্রমাণ, মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্রের বচনের দ্বারা কোনও মত সমালোচনা করে খণ্ডন করা হয়েছে, সে সময় থেকেই প্রাচীন ও নব্যস্মৃতির বিভাগ সূচিত হয়েছে। নব্য স্মৃতিতে প্রমাণ, যুক্তি ও মীমাংসা বাক্য দ্বারা পূর্বমত খণ্ডনপূর্বক স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে। রঘুনাথ শিরোমণির মাতামহ মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির কাল থেকে (পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে) বঙ্গদেশে নব্যস্মৃতির সূত্রপাত হয়। অবশ্য শূলপাণির মাধ্যমে নব্যস্মৃতির সূত্রপাত হলেও ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের দ্বারা তা পূর্ণতা লাভ করে। এজন্য নব্যস্মৃতি বলতে স্মার্ত ভট্টাচার্যের নিবন্ধ সাহিত্যকেই বোঝানো হয়। রঘুনন্দন তাঁর 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে'র দ্বারা যুগন্ধর স্মার্তরূপে বঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রঘুনন্দনের নাম বঙ্গদেশে এত সুপরিচিত যে, 'স্মার্ত' এই দ্ব্যক্ষর আখ্যাতেই তিনি চিরকাল অভিহিত। এই স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য সুগভীর পাণ্ডিত্য বলে বঙ্গদেশে নব্যস্মৃতির স্বর্ণযুগ নিয়ে আসেন। লক্ষণীয় দিক হল, সুপ্রাচীন কালে পূর্বভারতে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির প্রাচীন স্মৃতির নিয়মনীতি চালু ছিল। সময়ের ধারায় যুগের চাহিদার সাথে তাল রেখে রঘুনন্দন প্রাচীন স্মৃতির সংশোধন করেন।

স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ছিলেন শ্রীহট্টের গৌরব। তাঁর স্মৃতি গ্রন্থাদিতে নিজ পরিচয় সম্বন্ধে তিনি শুধু বলেছেন, তাঁর পিতার নাম হরিহর ভট্টাচার্য এবং তিনি বন্দ্যঘটী কুলের ব্রাহ্মণ। নিজের জন্মভূমি সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ করেন নি। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

রঘুনন্দের নিবাস পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, রঘুনন্দনের বংশধরগণ পূর্ববঙ্গে এখনও বর্তমান আছেন—

'পূজ্যপাদমহামহোপাধ্যায়-রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য-বন্দ্যঘটীয় বংশং পূর্ববঙ্গ প্রদেশঞ্চ জন্মনালংকৃতবন্তঃ। অদ্যাপি পূর্ববঙ্গপ্রদেশে তেষাং বংশ্যাঃ সন্তি।'[৫]

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের মতে, রঘুনন্দনের জন্মস্থান তদানীন্তন শ্রীহট্ট জেলার মান্দারকান্দি। বানিয়াচঙ্গ থেকে হবিগঞ্জ যাওয়ার পথে মান্দারকান্দি পরগনার অবস্থান। রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির সমসাময়িক ছিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য রঘুনন্দন নবদ্বীপে যান। সেখানে অধ্যয়ন করার পর টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। লক্ষণীয় দিক হল, রঘুনন্দন নব্যস্মৃতির পুরোধা-স্থানীয় ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর জন্মমাটিতে নব্য স্মৃতির খুব একটা প্রভাব নেই। তদানীন্তন শ্রীহট্টের পশ্চিমাঞ্চলে নব্য স্মৃতির বিধান অনুসরণ করা হলেও অন্যত্র তা গৃহীত হয়নি।

শ্রীহট্টের বৃহত্তর অঞ্চলে প্রাচীন স্মৃতি প্রচলিত। এ-অঞ্চলে পূজা-পার্বণ, ব্রতানুষ্ঠান, শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত-অর্থাৎ এক কথায় 'দশকর্ম' প্রাচীন স্মৃতির বিধানে অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীহট্টের পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র নব্য স্মৃতিকে কেন গ্রহণ করা হয়নি এর সম্ভাব্য কারণগুলি হল :

ক) নাগর ব্রাহ্মণ প্রব্রজন (খ) মিথিলা শ্রীহট্ট সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং (গ) শ্রীহট্টের সাংস্কৃতিক সচেতনতা -অর্থাৎ শ্রীহট্টের জনজীবনের রক্ষণশীল মানসিকতা, আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াস এবং সর্বোপরি পূর্বপুরুষদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি। এই কারণগুলি সঠিকভাবে নির্ণীত হলে সমাজ-ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হবে। এ-প্রসঙ্গে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে শ্রীহট্টের প্রাচীন পর্বের ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই শ্রীহট্ট একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। শ্রীহট্টের সুরমা নদী নামাঙ্কিত উপত্যকা পাণিনির যুগেও পরিচিত ছিল। পাণিনি ব্যাকরণের একটি সূত্র — 'দ্বঞ্মগধ-কলিঙ্গ -সূরমসাদণ্।[৬] এ সূত্রের ব্যাখ্যায় ভট্টজী দীক্ষিত লিখেছেন— '...আঙ্গঃ, বাঙ্গঃ, সৌহ্মঃ, মগধঃ, কালিঙ্গ সৌরমসঃ....।' সিদ্ধান্ত কৌমুদীর সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বাসু এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন- 'the son as well as the king of Anga, Vanga, Suhma, Magadha, Kalinga and Suramasa... they are the names of countries as well as Kshatriyas'[৭] অর্থাৎ আঙ্গ, বাঙ্গ, সৌহ্ম, মগধ, কালিঙ্গ, সৌরমস শব্দগুলির দ্বারা সেই সেই জনপদ ও দেশবাসীগণকে বোঝায়। সৌরমস শব্দের দ্বারা সুরমস/সুরমা অঞ্চল (উপত্যকা) অর্থাৎ শ্রীহট্ট জনপদ ও শ্রীহট্টবাসীগণকেই বোঝানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন V.S. Agarwal।[৮] অনুমান, পাণিনির কালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ইত্যাদির মত সুরমস/সুরমা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ সমতট পরিভ্রমণের সময় যে ছয়টি রাজ্যের নাম শুনেছিলেন, তার প্রথমটির নাম ছিল শিলিচটল। সমতটের সংলগ্ন পূর্বোত্তর দিকে এই রাজ্যটির অবস্থান ছিল।

এটিই শ্রীহট্ট বলে অনেকের অনুমান। উল্লেখ্য যে, হিউয়েন সাঙ্-এর এই উল্লেখ খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের। ছয় শত খ্রিস্টাব্দে জালন্ধর রাজবধূ যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন— সেই মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে আছে 'শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্যঃ'। এই শব্দ গুচ্ছ দেখে মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ অনুমান করেন, কামরূপের ভাস্করবর্মার শাসনের পূর্বেই শ্রীহট্ট নামক একটি দেশ ছিল। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে মৌলবীবাজার থানার পশ্চিমভাগ গ্রামে আবিষ্কৃত বঙ্গ হরিকেলের রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে ও ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্টের রাজা গোবিন্দকেশব দেব প্রদত্ত ভাটেরার প্রথম তাম্রশাসনে এবং ঐ বংশেরই ঈশানদেব প্রদত্ত ভাটেরার দ্বিতীয় তাম্রশাসনে শ্রীহট্টের স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। পঞ্চদশ/ষোড়শ শতকের যোগিনীতন্ত্রেও কামরূপের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহট্টেরও পৃথক নির্দেশ আছে :

ঐশান্যাং পূর্বভাগে চ কামরূপং বিভাবয়।
জালন্ধরস্ত বায়ব্যে কোলাপুরে তথোত্তরে।
ইশানে চৈব বেহারং মহেন্দ্রং কিয়দুত্তরে।
শ্রীহট্টং চাপি পূর্বে চ.....।।[১০]

খ্রিস্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে শ্রীহট্টে একটি দৃঢ়মূল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে অনেক রাজার আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণেরা দলে দলে শ্রীহট্টে আগমন করেন এবং বসতি স্থাপন করেন। অনেক ঐতিহাসিকেরই অনুমান, কুমার ভাস্করবর্মার পূর্বপুরুষ ভূতিবর্মা বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের পূর্ব থেকে শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণদের নিবাস ছিল। নিধনপুর গ্রামে আবিষ্কৃিত তাম্রশাসনে (১৯১২ খ্রিঃ) কুমার ভাস্করবর্মার পূর্বপুরুষ ভূতিবর্মা ২০৫ জন বিভিন্ন গোত্রনাম-ধারী বৈদিক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেন। হারিয়ে যাওয়া তাম্রফলকে আরও অনেক ব্রাহ্মণের নাম ছিল। ৪৪ হর্ষাব্দ বা ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লায় আবিষ্কৃত সমতটের সামন্ত রাজা লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসনের সূত্রে জানা যায়, লোকনাথের মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ প্রদোষ শর্মা সুবঙ্গ বিষয়ের অরণ্যময় ভূমিতে অনন্তনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তারই সন্নিকটে 'চতুর্বেদ বিদ্যাবিশারদ' দ্বিশতাধিক ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এই সুবঙ্গ বিষয়কেই অনেকে জাটিঙ্গা সংলগ্ন বর্তমান সমতল কাছাড়ের সুবঙ্গ অঞ্চল বলে মনে করেন। তাছাড়া মৌলবীবাজারের চৌতালী পরগনার কালাপুর গ্রামে আবিষ্কৃত সপ্তম শতাব্দীর সামন্ত রাজা মারুগুনাথের তাম্রশাসনেও অনন্তনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ভূমিদানের যোগসূত্রে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপনের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, খ্রিস্টীয় দশম শতকে চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্র ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে শ্রীহট্টমণ্ডলের গরলা, পগার ও চন্দ্রপুর বিষয়ে প্রায় সহস্র বর্গমাইল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভূমিদানের মাধ্যমে স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্রাহ্মণ সমাবেশের ব্যবস্থা করেন। রাজা শ্রীচন্দ্র স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও শ্রুতি -স্মৃতি প্রভৃতি আর্য-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট চতুঃসীমা বেষ্টিত ভূমিতে শ্রীচন্দ্রপুর নামে একটি সুবৃহৎ 'ব্রহ্মপুর' (ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য অনুযায়ী আদর্শ ঔপনিবেশিক

ধর্মসংস্থান) সৃষ্টি করেন এবং চার চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত মঠে ঋগ্বেদাদি চার বেদ পঠন-পাঠন হত ও বৈদিক দেবতা বৈশ্বানর, যোগেশ্বর এবং মহাকাল নিয়মিত মঠে পূজিত হতেন। লক্ষণীয় যে, এই তালিকায় পূর্বমীমাংসার লেখক জৈমিনিকেও দেবত্বে উন্নীত করে পূজা করা হত। এ সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্যঃ 'দুই প্রস্থ মঠেই এক এক জন করে যে চারজন দেবতা প্রতিষ্ঠিত তাঁরা হচ্ছেন বৈশ্বানর বা অগ্নি, যোগেশ্বর শিব, জৈমনি বা জৈমিনি এবং মহাকাল শিব। স্বাধীনভাবে একক বৈশ্বানর বা অগ্নির পূজা ও তাঁর জন্য মন্দির একটু বিস্ময়কর, যেহেতু এই ধরনের অগ্নিপূজা ও অগ্নিমন্দির বড়ই বিরল, প্রায় নেই বললেই চলে। তার চেয়েও বিস্ময়কর পূর্বমীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবক্তা জৈমিনির দেবত্বে উত্তরণ, ভারতবর্ষে জৈমিনির মঠ বা মন্দির আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।[১১]

শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণদের আগমন প্রসঙ্গে অন্য আরেকটি সূত্রে জানা যায়, ত্রিপুরাধিপতি আদি ধর্মপা একটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য মিথিলা থেকে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ গোত্রীয় পাঁচজন যজ্ঞনিপুণ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁরা ছিলেন বৎস গোত্রীয় শ্রীনন্দন, বাৎস্য গোত্রীয় আনন্দ, ভারদ্বাজ গোত্রীয় গোবিন্দ, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় শ্রীপতি ও পরাশর গোত্রীয় পুরুষোত্তম। যজ্ঞটি অনুষ্ঠিত হয় শ্রীহট্টের ভানুগাছ পরগনার মঙ্গলপুর গ্রামে ত্রিপুরাব্দ ৫১ বা খ্রিস্টাব্দ ৬৪১ সালে। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ শেষে তদানীন্তন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডে রাজ অনুগ্রহে ভূমি লাভ করে বসতি স্থাপন করেন এবং এঁদের তৎপরতায় মিথিলা থেকে কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় আরও পাঁচজন ব্রাহ্মক্ষণ পঞ্চখণ্ডে আসেন। এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাই শ্রীহট্টে মৈথিল সমাজ ও মৈথিল বেদাচারকে প্রসারিত করেন। মিথিলার সঙ্গে শ্রীহট্টের প্রাচীন সাংস্কৃতিক যোগসূত্র এই ব্রাহ্মণদের দ্বারাই তৈরি হয়েছিল এবং এজন্যই শ্রীহট্টে মৈথিল স্মৃতির প্রচলন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণদের একাংশ বলেন, তাঁরা কান্যকুব্জ থেকে এসেছিলেন। অন্যদল বলেন, লন, তাঁরা মিথিলা থেকে এসেছিলেন। অথচ সকলেই সেই দশ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদের উত্তরপুরুষ বলে দাবি করেন। অনেকে আবার তথাকথিত সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ বলেও পরিচয় দেন। শ্রীহট্টের এই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে) অচ্যুতচরণ চৌধুরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[১২]

ভূতিবর্মার সময়ের দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং ত্রিপুরাধিপতি আদি ধর্মপার সৌজন্যে আগত দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের গোত্র একই। তাহলে ষষ্ট শতাব্দীতে ভূতিভর্মার সময়ের ব্রাহ্মণেরা কোথা থেকে শ্রীহট্টে এসেছিলেন তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের অনুমান, নিধনপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত কায়স্থ পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণেরা ছিলেন লাট বা গুজরাট থেকে আগত নাগর ব্রাহ্মণ। এদের আদি বাসস্থান ছিল পাঞ্জাবের নাগরকোট, গুজরাট-কাথিয়াবাড়ের আনন্দপুর (অন্য নাম নগর) প্রভৃতি অঞ্চলে। ভাণ্ডারকরের (Indian Antiquary Vol-XI) ১৩ এই অভিমতকে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকজে. সি. ঘোষও (Indian Historical

Quarterly Vol-VI, pp. 67-71) দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন।[১৪] বরাকের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ড. সুজিৎ চৌধুরীও এ প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করে লিখেছেন, "ঐতিহাসিকদের একটা বড় অংশই মনে করেন নিধনপুর লিপির ব্রাহ্মণরা শ্রীহট্টে এসেছিলেন গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চল থেকে, অথবা সরাসরি সেখান থেকে না এলেও তাঁদের মূল বাসভূমি ছিল ঐ কাথিয়াবাড় অঞ্চল।"[১৫] লাট বা গুজরাট দেশীয় ব্রাহ্মণদের দূর দূরান্ত পাড়ি দিয়ে ভূমিদান গ্রহণের প্রমাণ পূর্বাঞ্চলের অনেক তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণদের প্রাথমিক উপনিবেশ ছিল উত্তর বিহার, উত্তরবঙ্গ এবং তারপর আরও অগ্রসর হয়ে শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে লাট বা গুজরাট দেশীয় ব্রাহ্মণদের ভূমিদান গ্রহণ ও পুরোহিত রূপে মন্দিরে নিযুক্তির খবর পাওয়া যায়। দানপত্রটি ঘোষিত হয় এভাবেই :

"রাজপাদোপজীবিনোহন্যাংশাকীর্ত্তিতান্ চাটভাট-জাতীয়ান যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহা-মহত্তর-দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সকরান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ ব্রাহ্মণমাননাপূর্বকং যথার্থং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।"[১৬]

দেবপালের মুঙ্গের লিপিতেও ভূমিগ্রহিতা 'চাট-ভাট জাতীয়' ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আরও উল্লিখিত হয়েছে— 'গৌড়-মালব-খস-হুন-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাট-ভাট-সেবকাদীন্ অন্যাংশাকীর্তিতান্।'[১৭]

শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রলিপিতেও অনুরূপভাবে 'রাজপাদোপজীবী' দানগ্রহীতাদের তালিকায় আছে-'চাটভট জাতীয়ান্। জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ ব্রাহ্মণোত্তরান্। যথার্হং মানয়তি। বোধয়তি। সমাজ্ঞাপয়তি চ।[১৮]

গুজরাটই লাট দেশ-এব্যাপারে পণ্ডিতরা সকলেই একমত। কোষগ্রন্থে (পৌরাণিকা ২য়) লাট বা লাড় দেশের সীমা নির্দেশ করে বলা হয়েছে, 'দক্ষিণ গুজরাটে খান্দেশ সমেত। মহানদী ও তাপ্তির নীচের মধ্যবর্তী দেশ। একটি মতে গুজরাট ও উত্তর কোঙ্কনের প্রাচীন নাম লাট।[১৯]

স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে নাগরব্রাহ্মণদের বিবরণ আছে। নাগর ব্রাহ্মণেরা লাটদেশ বা গুজরাটে হাটকেশ্বর শিব ও বিষ্ণুর পূজক ছিলেন। তাঁরা বেদ-বেদাঙ্গশাস্ত্রে পারঙ্গম, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞের অধিকারী এবং কন্যাযোগ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন :

অন্যেহপি নাগরাঃ সন্তি বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
শ্রাদ্ধাহাঃ যজ্ঞযোগ্যাম্প কন্যাযোগ্যা বিশেষতঃ।।[২০]

নাগরদের সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও বৈবাহিক সম্পর্ক একান্তভাবেই নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর অন্যথা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পতিত বলে গণ্য করা হত। সোমপান ও শ্রাদ্ধ কর্মে এঁদেরই অগ্রাধিকার ছিল :

অদ্য প্রভৃতি যঃ কন্যামবিদিত্বা তু নাগরম্।
নাগরো দাস্যতি কাপি পতিতঃ স ভবিষ্যতি।।

নাগরেণ বিনা যস্তু সোমপানং করিষ্যতি।
স করিষ্যত্যসন্দিগ্ধং মদ্যপানং তু নাগরঃ।।
তন্মতেন বিনা যস্তু শ্রাদ্ধকর্ম করিষ্যতি।
ততঃ সর্বং বৃথা তস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।[২১]

শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁদের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত :

নাগরা যাজিকাঃ সন্তি স্মার্ত্তাঃ শ্রুতিপরায়ণাঃ।[২২]

সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে তাঁরা মন্ত্র বলে সুস্থ করতে পারতেন। বিষের নামান্তর গর। সর্প দংশিতের চিকিৎসায় তাঁরা 'ন-গর', 'ন-গর' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল ব্যবহার করতেন। এ-জন্য তাঁদের আবাসস্থল চমৎকারপুরের অন্য নাম ছিল 'নগর'। এই ব্রাহ্মণেরা চমৎকার-রাজপত্নীর দান গ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রী জাতির দান গ্রহণ করায় সমাজে তাঁরা পতিত হন অর্থাৎ 'বাহ্যনাগর' রূপে গণ্য হন। দুর্বাসা মুনির দ্বারাও তাঁরা অভিশপ্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া সর্পগণের 'গর-নাশন' হেতু তাঁদের 'ত্রিজাতত্ব' দোষও হয়। 'এঁদেরে স্পর্শ করলে শুদ্ধিরও কোন উপায় ছিল না— 'পুনশ্চ কারণং তেষাং স্পর্শাদপি ন শুদ্ধিভাক্।' এ-সব দোষের পরিপ্রেক্ষিতে ভর্তৃযজ্ঞ নামধারী এক বিচক্ষণ ঋষি নাগরদের সমস্ত যজ্ঞকর্মে নিষিদ্ধ করেন :

অন্যচ্চ দূষণং তেষাং কীর্তয়িষ্যে তবানঘ।
ত্রিজাতাঃ স্থাপিতা রাজন সর্পাণাং গরনাশনাৎ।।
নগরত্বং ততো জাতং চমৎকারপুরস্য তু।
ত্রিজাতত্বস্তু সর্বেষাং জাতং তত্র বিশেষতঃ।।
এতেভ্যঃ কারণেভ্যশ্চ ভর্তৃযজ্ঞেন বর্জিতাঃ।
পুনশ্চ কারণং তেষাং স্পর্শাদপি ন শুদ্ধিভাক।। ১৯৯/১০৭-১০৯

ভর্তৃযজ্ঞ কর্তৃক একাংশ নাগর ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণোচিত অধিকার কর্তনের ফলে স্বাভাবত তাঁরা কিছুটা হলেও নিজস্ব মহিমা হারিয়েছিলেন। অবশ্য এঁদের জন্য শুদ্ধির ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এঁদের একদল শুদ্ধি-করণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করেননি। বরং তাঁরা বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করে দেশান্তরী হনঃ

'অস্মাভিস্তেন দোষেণ ত্যক্তং স্থানং নিজং হি তৎ।'

নাগর ব্রাহ্মাণদের যে অংশ শ্রীহট্টে এসেছিলেন বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা এই 'বাহ্য নাগর' ছিলেন বলেই মনে হয়। তৎকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা থাকলেও এই বহিরাগত নাগর ব্রাহ্মণদের পরিচিতি অনেকেরই জ্ঞাত ছিল। এ-জন্যই সম্ভবত ভূতিবর্মার সময়ে শ্রীহট্টে বসত-প্রাপ্ত বেদজ্ঞ নাগর ব্রাহ্মণ থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরাধিপতি আদি ধর্মপা যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য মিথিলা থেকে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে এনে যজ্ঞ শেষে পঞ্চখণ্ডে ভূমিদান করে তাঁদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই অনুমান হয়ত

অসঙ্গত হবে না, যজ্ঞের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার সূত্রেই কালে কালে সেই নাগরদের কেউ কেউ ব্রাহ্মণত্ব হারিয়ে ফেলেন। নিধনপুর তাম্রশাসনে এবং পশ্চিমভাগ লিপিতে ভূমিপ্রাপক কায়স্থ পদবীযুক্ত যাঁদেরনাম উল্লিখিত হয়েছে তাঁরাই হয়ত ব্রাহ্মণত্ব হারানো 'বাহ্য নাগর'।

শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর শিব একজন জনপ্রিয় দেবতা। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ, প্রথমভাগ, নবম অধ্যায়, পৃ. ১২৯) অনুযায়ী "শ্রীহট্টের গৌড়ের রাজা গৌড়গোবিন্দ কর্তৃক হাটকেশ্বর শিব পূজিত হইতেন ও তিনি মিনারের (মনা রায়ের) টিলা বা তন্নিকটবর্তী কোনও টিলায় স্থাপিত ছিলেন।"[২৩] এতে মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রোক্ত 'নকুলেশ কালীপীঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ' বচনের সত্যতাও প্রমাণিত হয়। ভাটেরা তাম্রশাসনে 'শ্রীহট্টনাথ শিবের' উল্লেখ আছে। এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্থান নামগুলির মধ্যে 'হট্ট' শব্দের ব্যবহার দেখে অনেকেই অনুমান করেন ভূতিবর্মার দ্বারা বসতপ্রাপ্ত নাগর ব্রাহ্মণেরা কেশবদেবের সময় শ্রীহট্টে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[২৪] মোগল আমলে নিধনপুরের নিকটে সুপাতলা গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন করার সময় প্রস্তরনির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয় এবং সেই সময় থেকেই পঞ্চখণ্ডের বাসুদেব বাড়িতে সেই বিষ্ণু মূর্তি পূজিত হচ্ছেন। অনুমান, এই বিগ্রহটি নাগর ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কমলাকান্ত গুপ্তের মতে, এই বিষ্ণু মূর্তিই নিধনপুর লিপির 'বলিচরুসত্রের' বিগ্রহ। নিধনপুর লিপিতে উল্লিখিত আছে, প্রদত্ত ভূমির সপ্তাংশ 'বলিচরুসত্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল— "বলিচরুসত্রোপযোগায় সপ্তাংশাঃ।[২৭]

বাসুদেব বাড়ির সম্মুখের পুকুর খনন কালে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি বিষ্ণু মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিগ্রহটিও বর্তমানে বাসুদেব বাড়ির পাশের মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন। ইদানীংকালে শ্রীহট্ট অঞ্চলে আরও অনেক বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন, জগন্নাথপুরের বাসুদেব মূর্তি, রাজার মার দিঘিতে প্রাপ্ত বাসুদেব মূর্তি, বাবুয়ানি দিঘিতে প্রাপ্ত বিশালাকৃতি বাসুদেব মূর্তি, বিষ্ণুপুর ছয়চিরিতে প্রাপ্ত বাসুদেব মূর্তি।২৭ শিববিগ্রহের 'হাটকেশ্বর' নাম এবং বিষ্ণুপূজার ব্যাপকতা শ্রীহট্টে নাগর ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপনের ইঙ্গিতবাহী। তবে তা আরও অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

যাই হোক, ত্রিপুরাধিপতি আদি ধর্মপা আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণদের পূর্ববর্তী কালে আগত ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মৈথিল বলেই পরিচয় দেন। এক্ষেত্রেও অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে মৈথিল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নগর ব্রাহ্মণদের কোন সংযোগ আছে কি না। একথা বলার কারণ, দেবপালের মুঙ্গের লিপিতে মৈথিল ঐতিহ্যের এই যোগসূত্রেই শ্রীহট্টে বৈদিক স্মৃতির বা স্মার্ত চূড়ামণি বাচস্পতি মিশ্রের রচিত প্রাচীন স্মৃতির প্রচলন হয়। প্রাচীন স্মৃতির ধারক বলেই এই অঞ্চলকে 'মনুকুল' বলা হয়। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী পুরাকালে মনু এই স্থানেই শিবের অর্চনা করেছিলেন বলে এখানে প্রবাহিত নদী 'মনু' নামে খ্যাত হয় :

পুরাকৃত যুগে রাজন মনুনা পূজিতঃ শিবঃ।
তত্রৈব বিরলে স্থানে মনু নাম নদী তটে।।[২৮]

মিথিলার স্মার্ত পণ্ডিতদের স্মৃতিগ্রন্থ সমূহ বরাক-সুরমা উপত্যকায় বহুকাল থেকেই অনুসৃত হয়ে থাকে। এই স্মৃতিগুলিকেই এই অঞ্চলে শ্রীহট্টীয় প্রাচীন স্মৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই স্মৃতিগুলির বিধান মেনেই এই অঞ্চলে দশ-কর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পঞ্চদশ/ষোড়শ শতক পর্যন্ত শ্রীহট্টের অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান মিথিলায় গিয়ে ন্যায়, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করতেন। শ্রীহট্টের খ্যাতকীর্তি প্রতিভাধর একচক্ষু রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় গিয়ে ন্যায়শাস্ত্রে বিদগ্ধ পক্ষধর মিশ্রের নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "পঞ্চদশ/ষোড়শ শতকে মিথিলাই তো ছিল অন্যতম বিদ্যা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র যাহাকে বাংলার পণ্ডিতরা পরমতীর্থ বলিয়া মনে করিতেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বাঙালীরও পরমপ্রিয় কবি। উত্তরবঙ্গের এবং শ্রীহট্টের কোথাও কোথাও বহুদিন পর্যন্ত মৈথিল স্মৃতির প্রচলন ছিল, এখনও আছে; বাচস্পতি মিত্রের স্মৃতি এখনও শ্রীহট্টের কোন কোন টোলে পঠিত হয়ে থাকে; প্রচুর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতি গ্রন্থের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে"।[২৯] পরবর্তী কালে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সন্তানদের শাস্ত্র অধ্যয়নের পীঠস্থান নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হলেও মিথিলার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। অনেক শ্রীহট্টের পণ্ডিত নবদ্বীপে ন্যায়, স্মৃতি শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়নের পর সেখানে টোল প্রতিষ্ঠা করে অধ্যাপনা করেন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য পূর্ব ভারতে কাশীর পরই ছিল নবদ্বীপ ও শ্রীহট্টের স্থান। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরস্থিত নবদ্বীপ ছিল সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র আর শ্রীহট্টীয় ব্রাহ্মণ সন্তানেরা ছিলেন বিদ্যার্জনে বিশেষ যত্নশীল। গঙ্গা তীরে বাস ও জ্ঞানার্জনে আগ্রহী ব্রাহ্মণ সন্তানেরা তখন নবদ্বীপে গিয়ে বসবাস করতেন। শ্রীহট্টীয় নবদ্বীপবাসী উল্লেখযোগ্যরা হলেন জগন্নাথ মিশ্র, মাধবেন্দ্র পুরী, অদ্বৈতাচার্য, নীলাম্বর চক্রবর্তী, শ্রীবাস পণ্ডিত, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, বল্লভাচার্য, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার প্রমুখ। স্বরূপ-পত্র নামক ময়মনসিংহের এক ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

বহু শ্রীহট্টীয়া বিপ্র নবদ্বীপে বৈসে।
সম্বন্ধবাদ চলে তথা দেশে নাহি আইসে।।

নবদ্বীপে শ্রীট্টীয়া পাড়ায় এঁদের নিবাস ছিল। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, বরুঙ্গার জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বৎস গোত্রীয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম। শ্রীহট্টীয়া ব্রাহ্মণ মনীষা-প্রসূত নবদ্বীপের যে চারটি প্রধান গৌরব, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রেম ধর্মের বিকাশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।' চৈতন্য ভাগবতে আছে :

বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ।।

শ্রীচৈতন্যলীলার অন্তরঙ্গ পর্যদদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শ্রীহট্টীয়া। যেমন, লাউড়-

নবগ্রামের অদ্বৈত আচার্য, দুলালীর মুরারি গুপ্ত, পঞ্চখণ্ডের রঘুনাথ শিরোমণি, অনি পণ্ডিতের শ্রীবাস পণ্ডিত, ঢাকাদক্ষিণের যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রমুখ। এঁরা সবাই শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন।

শ্রীহট্টের যে সমস্ত প্রতিভাধর নানা কারণে নবদ্বীপে অধ্যয়নের জন্য যেতে পারেননি তাঁরা শ্রীহট্টেই তৈরি করেন নব-নবদ্বীপ। শ্রীহট্টের পণ্ডিত-অধ্যুষিত বহু জনপদ ক্ষুদ্র নবদ্বীপ নামে পরিচিত হয়। শ্রীহট্টের বাইরে শ্রীহট্ট পণ্ডিতদের দেশ (land of philosophers) নামে খ্যাত হয়। নবাবি আমলেও শ্রীহট্ট শাস্ত্রীয় শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার আশীদ্রোণ অঞ্চলে ষাটটি টোলে সংস্কৃত পড়ানো হত। ইটা পরগনার ভূমিউরা গ্রামে পণ্ডিত রাজগোবিন্দ সার্বভৌমের টোলে ছাত্র সংখ্যা ছিল পাঁচ শতেরও অধিক।[৩০] ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শ্রীহট্টের বহু গ্রামে-যেমন, ইটা, লংলা, বরমচাল, সাতগাঁও, পঞ্চখণ্ড, রেঙ্গায় চতুষ্পাঠী ছিল। এই সমস্ত টোলে কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় নানা বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকলেও ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের চর্চা হত অধিক। আবার স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীহট্টীয় বা মৈথিল স্মৃতিরই অধ্যয়ন হত। বৃহত্তর শ্রীহট্ট-কাছাড় মৈথিল স্মৃতির ধারক বলেই এ-অঞ্চলে মৈথিল স্মৃতিকেই শ্রীহট্টীয় স্মৃতি বলেই অভিহিত করা হয়। পূর্বাঞ্চলের কোন কোন সংস্কৃত বোর্ডে স্মৃতি শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় শ্রীহট্টীয় প্রাচীন স্মৃতি নামে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্তের আলাদা পত্র আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের দেশ মিথিলায় মধ্যযুগে ব্রাহ্মক্ষণ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় স্মৃতি-নিবন্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছে অধিক পরিমাণে। শ্রীদত্ত উপাধ্যায়, গহেশ্বর মিশ্র, গণেশ্বর মিশ্র, চণ্ডেশ্বর, হরিনাম উপাধ্যায়, বর্ধমান উপাধ্যায় প্রমুখ প্রসিদ্ধ স্মৃতিকারদের স্মৃতি-সাহিত্য সেই সময় রচিত হয়েছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে মিথিলায় স্মৃতি সাহিত্য জগতে অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সমাবেশ হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন পরমগুরু বাচস্পতিমিশ্র। তাঁর কার্যকাল ১৪২৫-১৪৭৫ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। তাঁর প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের দশটি এবং স্মৃতিবিষয়ে ছিল একত্রিশটি গ্রন্থ।[৩১] এইগুলির অনেকটি এখনও মিথিলা, বঙ্গদেশের কোন কোন অঞ্চলে ও বরাক-সুরমা উপত্যকায় পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদ চিন্তামণি' ব্যবহার বিষয়ের ওপর বিখ্যাত গ্রন্থ। শুদ্ধিচিন্তামণি, কৃত্যচিন্তামণি, শ্রাদ্ধচিন্তামণি, সম্বন্ধ চিন্তামণি গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য হিসাবে এখনো বরাক-সুরমা উপত্যকায় গৃহীত হয়ে থাকে। অনেক পণ্ডিত এই গ্রন্থগুলির ভাষ্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক সেগুলির অনেকটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়নি বা অনেকগুলি হারিয়ে গেছে।

শোনা যায়, সেই সময় মিথিলার পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে আসতে দিতেন না। অনেক প্রতিভাধর পণ্ডিত সেইগুলি কণ্ঠস্থ করে নিয়ে আসতেন এবং দেশে ফিরে লিপিবদ্ধ করতেন। সে রকম বাচস্পতি মিশ্রের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হয়েছে। সেটি 'দ্বৈত-নির্ণয়' ব্যবহারের সন্দিগ্ধ বিষয়ের ওপর (on doubtful points of law) বাচস্পতি মিশ্রের সবচেয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা।

সম্প্রতি প্রাচীন মতাবলম্বী হস্তলিখিত 'ঋগ্বেদীয় দশকর্ম পদ্ধতি' নামে একটি পুথি আমাদের নজরে এসেছে। পুথিটি শিলচর তারাপুরের শ্রীমানিক ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। স্মৃতিগ্রন্থটির রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালেশী পণ্ডিত। পুষ্পিকা অংশটি এই— 'মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালেশিনা পণ্ডিতেন কৃতা ঋগ্বেদীনাং দশকর্ম পদ্ধতিঃ সমাপ্তা।। শ্রীহট্টজেলান্তর্গত ঢাকাদক্ষিণ পরগণান্তবর্তী কানিশালি গ্রামবাস্তব্যেন কাশীশ্বর শর্মণঃ প্রপৌত্রেণ কুর্পরেশ্বর শর্মণঃ পৌত্রেণ কালীনাথশর্মণঃ পুত্রেণ মথুরেশ বাচস্পতিবংশাবতংসেন ভরদ্বাজ গোত্রীয়েণ ভিষগরত্নে কবিরাজেন শ্রীকৃপেশরঞ্জন শর্মণা লিখিতেয়ং। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তিঃ।'

এ-অঞ্চলে প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বা রচনা করে অনেকেই দেশে খ্যাতকীর্তি হয়েছিলেন। অনেকেই ছিলেন প্রচারবিমুখ। স্বনামধন্য সেই সব প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতদের নামের তালিকাটি অনেক দীর্ঘ। অজ্ঞানতা বা অসাবধানতাবশত অনেকেই বাদ পড়ে যেতে পারেন— এই ভয়ে তাঁদের নামের তালিকাটি উল্লেখ করা হল না।

স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের নব্য স্মৃতি ও শ্রীহট্টীয় প্রাচীন স্মৃতির তুলনামূলক আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেই সব পার্থক্যগুলি আচার-ব্যবহার, পূজা-পার্বণ, ব্রতানুষ্ঠান, অশৌচ নির্ণয় শ্রাদ্ধাধিকারী ইত্যাদি ক্ষেত্রেই দৃষ্টিগোচর হয়। নব্যস্মৃতি ও প্রাচীন স্মৃতির তুলনামূলক আলোচনায় যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তার দিঙমাত্র এখানে লিপিবদ্ধ করা হল :

(১) নব্য মতাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা পূজা-পার্বণ ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্কল্পবাক্যে 'দেবশর্মা' বলেন, প্রাচীনপন্থীরা সেই স্থলে শুধু 'শর্মা' বলেন।

(২) স্মার্তমতে স্ত্রীদের বিবাহ বা পিণ্ডদানের সময় উত্তরীয় বস্ত্র বামস্কন্ধ থেকে দক্ষিণস্কন্ধ বেষ্টন করে যজ্ঞোপবীত ধারণের মত পরিধান করতে হয়। কিন্তু মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের মতে স্ত্রীলোকের বস্ত্রদ্বয় মাত্র ধারণ করলেই চলবে, তাদের আর উত্তরীয় বস্ত্র দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করতে হবে না।

(৩) বাংলায় প্রায় সর্বত্র দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত 'দুর্গাপূজা তত্ত্ব' অনুযায়ী। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত বা দেবীপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা বিধিরও প্রচলন আছে। স্মার্ত রঘুনন্দন শ্রীহট্টের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বরাক-সুরমা উপত্যকায় তাঁর বিধিটি অনুসৃত হয় না। বরাক-সুরমা উপত্যকায় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর' নির্দেশ অনুযায়ী।

(৪) 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' অনুযায়ী দেবীর পত্রী প্রবেশের পূর্ব দিন সন্ধ্যাবেলা জ্যোষ্ঠানক্ষত্র ও ষষ্ঠী তিথির একটিও প্রাপ্তি হোক বা না হোক বিশ্ববৃক্ষে দেবীর ষষ্ঠী কৃত্য অর্থাৎ আমন্ত্রণ করতে হয়—

পত্রীপ্রবেশাৎ পূর্বেদ্যুর্থা তিথিঃ প্রতিপদ্যতে।
তত্রৈব বোধয়েদ্দেবীং নাত্র ষষ্ঠী পুরস্ক্রিয়া।।

কিন্তু নব্যপন্থী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য এই মতটি স্বীকার করেননি। তাঁর মতে সেদিন ষষ্ঠী তিথি

যতক্ষণ প্রাপ্তি হবে, সে সময়ের মধ্যে দেবীর বোধন করতে হবে। এমনকি দিনের বেলায়ও করা যাবে; পত্রী প্রবেশের পূর্ব পূর্ব দিনও সায়ংকালে এই কৃত্য করা যায়।

(৫) স্মার্ত ভট্টাচার্য অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে 'সন্ধিপূজার' ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্তু 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে সন্ধি পূজা নেই।

(৬) দুর্গাপূজায় রঘুনন্দন নবমী পূজার শেষে দক্ষিণা দানের বিধান দিয়েছেন এবং সেই মত বাংলার সর্বত্রই প্রচলিত। কিন্তু 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে দেবী বিসর্জনকে দেবী পূজার অঙ্গ স্বীকার করে দেবী বিসর্জনান্তে দক্ষিণা দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৭) অশৌচাদি বিঘ্নজনিত যথাকালে শ্রাদ্ধের বিঘ্ন ঘটলে ঐ পতিত শ্রাদ্ধের যে অমাবস্যাতে অনুষ্ঠান বিধান করা হয়েছে, তা অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে ঐ পতিত শ্রাদ্ধ করলে বিশেষ ফল লাভ হয় বলে স্মার্ত ভট্টাচার্যের মত। কিন্তু মৈথিলগণের মতে কোন বিঘ্নবশত যথাকালে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান না হলে শুক্লপক্ষেরই হোক বা কৃষ্ণপক্ষেরই হোক একাদশী তিথিতে ঐ পতিত শ্রাদ্ধ করা যায়। তবে কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে করলে বিশেষ ফল লাভ হবে।

(৮) স্মার্ত মতে স্ত্রীলোকের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। 'বৃষোৎসর্গে স্ত্রীণামপি অধিকারোহস্তি'-রঘুনন্দন হলায়ুধের এই বচন সমর্থন করে বিধান দিয়েছেন স্ত্রীলোকের কন্যাদানে ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে অধিকার আছে- 'কন্যাদানে বৃষোৎসর্গে হ্যধিকারো ভবেদ ধ্রুবম।' কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে কন্যাদানে স্ত্রীলোকের অধিকার স্মার্তদের মধ্যে প্রচলিত নয়। মৈথিল মতে স্ত্রীলোকের কন্যাদানে বা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে অধিকার স্বীকৃত হয়নি।

(৯) প্রেতক্রিয়ার অধিকারী নিরূপণ প্রসঙ্গে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের মত - প্রথমে জ্যেষ্ঠপুত্র অধিকারী, তার অভাবে যথাক্রমে কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র অধিকারী। এদের অভাবে পত্নী অধিকারিণী, পত্নীর অভাবে দুহিতা, তাদের মধ্যে প্রথমে অদত্তা, তারপর বাগদত্তা ও পরে দত্তা কন্যার অধিকার। এদের অভাবে দৌহিত্রের অধিকার নিরূপিত হয়েছে নব্য মতে। কিন্তু শূলপাণি তাঁর 'শ্রাদ্ধবিবেকে' দুহিতার পর সহোদরের অধিকার, তার অভাবে তৎপুত্র, তদভাবে সাপত্ন্য ভ্রাতা ইত্যাদি। পরে সপিণ্ড, সমানোেদক, সগোত্র ইত্যাদির অভাবে দৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করেছেন। 'শ্রাদ্ধচিন্তামণি'তে প্রাচীন পন্থী বাচস্পতিমিশ্রও অপুত্রক ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কার্যের অধিকারী নিরূপণে পত্নীর অভাবে দুহিতা, দুহিতার অভাবে সহোদর, তদভাবে তৎপুত্র ইত্যাদিরূপে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ নব্যঅধিকার নিরূপিত হয়নি। প্রাচীন মতে এরূপ অবস্থায় দুহিতার পর সহোদর ভ্রাতারই অধিকার।

(১০) প্রাচীন মতে সপত্নী পুত্রের পূর্বে পতির প্রেতক্রিয়ার অধিকার। অতএব সেক্ষেত্রে চন্দন ধেনুদান হবে না, কারণ পুত্র অধিকারী স্থলেই চন্দনাঙ্কিত ধেনুৎসর্গের বিধান। কিন্তু স্মার্তরা প্রাচীন মতটি খণ্ডন করেছেন। তাদের মতে স্ত্রীলোকের প্রেতকর্মে সপত্নীপুত্রের পর পতির অধিকার।

(১১) মৃত্যুকালে পুত্রাদি অনুপস্থিত থাকায় যদি অপর ব্যক্তি প্রথম পিণ্ডদান করে, পরে পুত্রাদির

আগমনের পরও দশ দিন যাবৎ কর্তব্য পিণ্ডদান সেই ব্যক্তিই করবে, পুত্রাদি আর করবে না। তখন পুত্রাদি দশ পিণ্ডদান ব্যতীত অন্য সবই প্রেতকার্য করবে। রঘুনন্দনের 'শুদ্ধিতত্ত্বে' আছে :

অসগোত্রঃ সগোত্রো বা যদি স্ত্রী যদি বা পুমান।
প্রথমেহহনি যো দদ্যাৎ স দশাহং সমাপয়েৎ।।

অবশ্য এতদঞ্চলে স্মার্তদের মধ্যে রঘুনন্দনের এই মতটি প্রচলিত নয়।

প্রাচীন স্মৃতির মতে— মৃত ব্যক্তিকে দাহ করলেই পুরক দিতে হয়। শ্রাদ্ধাধিকারী উপস্থিত না থাকায় অন্য ব্যক্তি সৎকার করলে যদি পূরক দেওয়ার পূর্বে শ্রাদ্ধাধিকারী আসে, তবে সেই পুরক দিবে। আর যদি দাহকারী একটি পূরকও দিয়ে থাকে, তবে সে দশটি দেবে এবং শ্রাদ্ধাধিকারীও দশটি পূরক দিয়ে শ্রাদ্ধ করবে। এ-স্থলে দুজনেরই পূরক দিতে হবে।

(১২) সমাজে সিদ্ধ চাল ভক্ষণ বহুলভাবে প্রচলিত হওয়ায় স্মার্ত ভট্টাচার্য হবিষ্যান্ন ব্যতীত অন্যত্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই সিদ্ধ চাল ভক্ষণে দোষ নেই বলে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্তু প্রাচীন মতে সিদ্ধ চাল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। 'প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে'র টীকাকার গোবিন্দানন্দও 'পুনঃ সিদ্ধং দ্বিঃস্বিন্নমিত্যর্থঃ। ত্রিরাত্রম্' ইত্যাদি বিধানের দ্বারা সিদ্ধ চাল ভক্ষণে ত্রিরাত্র ব্রত আচরণ করতে বলেছেন।

'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'য় অশৌচাদি ব্যবস্থায় নব্য স্মৃতি থেকে শ্রীহট্টীয় স্মৃতি (প্রাচীন স্মৃতি) মতে যে সব ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, তা বিস্তারিত নিরূপণ করেছেন করিমগঞ্জের সন্নিকটস্থ মাইজগ্রামের স্মৃতিসম্রাট শচীন্দ্র চন্দ্র পঞ্চতীর্থ, ধর্মবেদশাস্ত্রী মহাশয়। এ-জন্য সেগুলির আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করি।

উল্লেখপঞ্জি

১ মনুসংহিতা ২/১০

২ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/১০

৩ বৃহস্পতি, সংস্কারতত্ত্ব, পৃ. ৩১৬

৪ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, মলমাসতত্ত্ব, পৃ. ২৬০

৫ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, উদ্বাহচন্দ্রালোকের ভূমিকা।

৬ পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী ৪/১/১৭০; সিদ্ধান্ত কৌমুদী ১১৮৮।

৭ S. C. Vasu, The Siddhanta Kaumudi Vol.-I, Motilal Banarsidass, p.674.

৮ V. S. Agarwal, India as known to Panini, University of Lucknow, 1953, p.60.

৯ মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, কামরূপশাসনাবলী, বারাণসী, ১৩৩৮, পৃ. ৪

১০ যোগিনীতন্ত্র, দ্বিতীয়ভাগ, প্রথম পটল, ১৩-১৪, খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস, মুম্বাই ৪০০০০৪

১১ ড০ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৪০০, পৃ. ৬৩১

১২ অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ১৯১১, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়

১৩ ড০ সুজিৎ চৌধুরী, শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস (১ম খণ্ড) ১৩৯৮, পৃ. ৭০ দ্রষ্টব্য

১৪ ঐ

১৫ ঐ

১৬ D. C. Sircar, Select Inscriptions, Motilal Banarsidass, Delhi, 1983, p.68

১৭ ড০ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, পৃ. ২৬৭ দ্রষ্টব্য

১৮ D. C. Sircar, Select Inscriptions, p.97

১৯ অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৪৬০

২০ স্বন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড, ১৯৯/৮৫

২১ ঐ ২০০ / ৩০

২২ ঐ ২০৬ / ১৮

২৩ রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রসঙ্গ শ্রীহট্ট, কলিকাতা-১, ১৯৮৮, পৃ. ৬,২৫ ও ৩০

২৪ ড০ জন্মজিৎ রায়, 'ভাটেরা তাম্রশাসন: প্রেক্ষাপট, বিতর্ক ও ব্যাখ্যাসূত্র', শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা, শিলং, ১৯৯৬ পৃ. ৪০ দ্রষ্টব্য।

২৫ Kamalakanta Gupta, Copper Plates of Sylhet, Vol.- 1,1967, pp. 64-65

২৬ ম০ ম০ পদ্মনাথ ভট্টচার্য বিদ্যাবিনোদ, কামরূপ শাসনাবলী, পৃ. ২৫

২৭ রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রসঙ্গ শ্রীহট্ট, পৃ. ৩০

২৮ ঐ পৃ. ১ দ্রষ্টব্য।

২৯ ড০ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৬৯

৩০ রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রসঙ্গ শ্রীহট্ট, পৃ. ১৪২

৩১ Dinesh Chandra Bhattacharya, 'The Nibandhas', The Cultural Heritage of India, Vol. II, Calcutta, 2000, pp. 371-372

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি : শতবর্ষ পূর্বের চিঠিপত্রের আলোকে

জন্মজিৎ রায়

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি (১৮৬৬-১৯৫৩) দক্ষিণ আসামের আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে একটি কিংবদন্তীপ্রতিম ব্যক্তিত্বরূপে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর বহুমুখী সারস্বত সাধনার সর্বাধিক পরিশ্রমী কীর্তি হচ্ছে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের দুটি খণ্ড। জীবনীকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও কবিরূপেও তাঁর পরিচিতি তাঁকে বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজে যশস্বী করেছিল। করিমগঞ্জ শহরের নাতিদূরস্থ মৈনা গ্রামের মতো একটি অখ্যাত অঞ্চলে থেকেও তিনি যে অসাধ্যসাধন করেছিলেন, তার মূলে ছিল তাঁর নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও সাধনা। সেকালের কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ছিল। এঁদের মধ্যে 'অমিয় নিমাই রচিত'-প্রণেতা শিশিরকুমার ঘোষও অন্যতম প্রধান। কিন্তু এ-সকল চিঠিপত্র কীটদষ্ট হয়ে এবং অন্যভাবে বিলুপ্ত-বিনষ্ট হয়েছে। এখানে যে কয়েকটি চিঠি প্রকাশ করা হল, তার সবকটিই অচ্যুতচরণের লেখা। চিঠিগুলি আমাকে দিয়েছিলেন করিমগঞ্জের স্বর্গত জগদিন্দু সেন মহাশয়। চিঠিগুলি প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন বলে এখানে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। চিঠিগুলি অচ্যুতচরণ লিখেছিলেন জগদিন্দু সেনের পিতা প্রহ্লাদচন্দ্র সেন পুরকায়স্থকে। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে তাঁর পারিবারিক পদবি থেকে প্রথমে 'পুরকায়স্থ' বর্জিত হয় এবং পরে 'সেন' শব্দের পরিবর্তে 'দাস' ব্যবহার করতে থাকেন প্রহ্লাদচন্দ্র। অচ্যুতচরণও ছিলেন পরম বৈষ্ণব। চতুর্থ চিঠির উপরিভাগে ইংরাজিতে লেখা নাম-ঠিকানা দেখে মনে হয়, অচ্যুতচরণও সেটা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, অচ্যুতচরণ তাঁর একটি ছাড়া বাকি চিঠিগুলিতে 'দীন-অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি' লিখে নাম সই করেছেন। 'তত্ত্বনিধি' উপাধিটি তাঁর প্রিয় ছিল এবং তিনি অধিকাংশ চিঠিপত্রেই এটা ব্যবহার করতেন।

এখানে প্রকাশিত সবকটি চিঠিই আজ থেকে অল্পাধিক একশ বছর আগের। প্রথম চিঠিতে তারিখ রয়েছে ২ বৈশাখ, ১৩১১। খ্রিস্টাব্দের গণনায় তারিখটি হচ্ছে ১৪ এপ্রিল, ১৯০৪ সাল। পরের চিঠির তারিখ হচ্ছে ৪ জুলাই। খ্রিস্টীয় সনের উল্লেখ নেই। পত্রে বর্ণিত বিষয় থেকে মনে হয়, এটাও ১৯০৪ সালেরই চিঠি। বাংলা তারিখ হবে ১৩১১ সনের ২০ আষাঢ়। তৃতীয় চিঠিতে শুধুমাত্র ১০ শ্রাবণ উল্লিখিত, বাংলা সনের উল্লেখ নেই। ১৩১১ বঙ্গাব্দ ধরে নিলে (বলাবাহুল্য, সেটাই যুক্তিযুক্ত) খ্রিস্টীয় সন-তারিখ হবে ২৫ জুলাই, ১৯০৪। চতুর্থ ও শেষ চিঠিখানিতে পরিষ্কার তারিখের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, ১৩।৮।০৪, অর্থাৎ ১৯০৪ সালের ১৩ আগস্ট। বাংলা সন-তারিখ দাঁড়াবে ২৯ শ্রাবণ, ১৩১১। চিঠিগুলি ২রা বৈশাখ, ১৩১১ থেকে ২৯শে শ্রাবণ, ১৩১১ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। অচ্যুতচরণের বয়স তখন

উনচল্লিশ। চিঠিগুলি অচ্যুতচরণের ব্যক্তিজীবন ও সারস্বত সাধনার বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করছে। অচ্যুতচরণ মহাবিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা-ধারী ছিলেন না। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার নাভিকেন্দ্র কলকাতা থেকে এতটা দূরে অবস্থান করেও এবং দক্ষিণ আসামের ছোট একটি মহকুমা শহরের অদূরবর্তী একটি অখ্যাত গ্রামের নিবাসী হয়েও চল্লিশ বছরে পা রাখার আগেই তিনি 'তত্ত্বনিধি' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, বেশ কয়েকজন বৈষ্ণব মহাপুরুষের জীবন-চরিত রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন এবং 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' রচনার কাজে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। একটি চিঠিতে দেখা যায়, তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। অচ্যুতচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনীকার অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের কন্যা শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, অচ্যুতচরণ তাঁর জীবৎকালে ছয় শত প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেছিলেন। উত্তর জীবনে তিনি যে সুশীলকুমার দে কিংবা বিমানবিহারী মজুমদারের গবেষণাগ্রন্থের পাদটীকায় স্থান করে নিয়েছিলেন, তার পেছনে ছিল স্ব-শিক্ষিত এই সারস্বতসাধকের দীর্ঘ সাধনা আর অধ্যবসায়।

।। ১।।

শ্রীহরি শরণ

শ্রীহট্ট

সসম্মান নিবেদন---

আপনার বিস্তৃত পত্র পাইলাম। আমি কতক দিন যাবৎ শ্রীহট্ট (সহরে) আসিয়াছি। আপনার পত্র Redirect হইয়া এখানে আসিয়াছে। ইহা একেই ত বিলম্বে পত্র পাইয়াছি এবং উত্তর দিতেও বিলম্ব হইল। ২।৩ দিন পরেই বাড়ী যাইব। এ পত্রের উত্তর বাড়ীর ঠিকানায় লিখিয়া আনন্দিত করিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিত [১]যে আপনাদের ভাল লাগিয়াছে, ইহাতে পরম আনন্দ লাভ করিলাম, কিন্তু সে গুণ আমার নহে, আপনাদের। নিতাইরমণ [২]ছাপা হইয়াছে। তবে অনেকটা সংক্ষিপ্তভাবে। যা হৌক, আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বলিয়া সুখী হইয়াছি। ভক্তের অভিপ্রায় ভগবান সফল করিয়া থাকেন।

শ্রীসারদাবাবুর [৩]উত্তরও বাহির হইয়াছে, তবে অনেকটা printing mistake থাকিয়া যাওয়ায় প্রবন্ধটা (অস্পষ্ট) বোধ হয় নাই।

আপনে[৪] ঠাকুরবাণী [৫]সম্বন্ধে অনেকটা কথা লিখিয়া সুখী করিয়াছেন। আমি প্রাচীন "বাণীচরিত্র" গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইতিহাসে ঠাকুরবাণীর কাহিনী লিখিবার কালে আপনার প্রদত্ত কথা (প্রতিবাদ) কাজে লাগিবে। এখন আলোচনা পূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি। এ সম্বন্ধে এবং অন্যান্য (শ্রীহট্ট সম্বন্ধে যে কোন) বিষয় সম্বন্ধে আপনার যাহা জানা আছে, আমাকে লিখিয়া সুখী করিবেন। ঠাকুরবাণীর বিষয়ে অতঃপর

আপনাকে আমার মত জানাব।

সম্প্রতি একটা বিষয় আপনাকে লিখিতেছি। এ সম্বন্ধে আপনে একটু চেষ্টা করিলে বাধিত হই। ২০।২৫ দিনের অধিক হইল, আমি শ্রীযুক্ত রিপ কমিশনার বাহাদুর কাছে একখানা দরখাস্থ পাঠাইয়াছি। শ্রীহট্টে একটা সাহিত্যিক বৃত্তি আসামে স্থাপিত হউক, এবং আমাকে সেই বৃত্তি প্রদত্ত হউক, দরখাস্থখানার মর্ম্ম ইহাই।

. . .

এখানকার পদ্মনাথবাবু প্রভৃতি বলেন-- সে দরখাস্তে ফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, আপনে এ জন্য একটু পরিশ্রম করিয়া চিরবাধিত করিবেন। উত্তর যথাসম্ভব সত্বর পাঠাইবেন।

ইতি ২ বৈশাখ ১৩১১ বাং

দীন -- শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি

।। ১।।

শ্রীহরি

সসম্মান নিবেদন---

আপনার পত্র পাইয়া বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরমানন্দিত হইলাম। লালা আনন্দরাম[৭] ও অপর যাহা আপনে দিবেন, তজ্জন্য আগ্রহান্বিত রহিলাম। এ স্থলে শ্রীমোহিনীবাবুর[৮] কীর্ত্তি কিছু বলি। উনি ঢাকাবাসী ও আলিআমজাদের[৯] নায়েবপুত্র।

যখন পদ্মনাথবাবু[১০] আমার সহিত যোগ দেন নাই, তৎকালে আমি একাকী নিরবে শ্রীহট্টের অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতপূর্ব্বক প্রেসে দিবার উদ্যোগে ছিলাম। আলিআমজাদ কিছু খর্চ্চ দিবেন বলিয়া আশা দেন ও পুস্তক দেখিতে চাহেন। আমি পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া দেই, কিন্তু তিনি ব্যয়ও দিলেন না এবং পাণ্ডুলিপিখানা ফেরতও দিলেন না; তৎপর দিল্লি দরবারে চলিয়া যান। এই সময়ই পদ্মনাথবাবু আমার বাড়ী আসেন এবং একযোগে কার্য করিতে অনুরোধ করেন। আমি তাহাতে সহজেই স্বীকৃত হই। মোহিনীবাবুর ক্ষুদ্রতম পুস্তিকা সেই পাণ্ডুলিপির সংক্ষেপেতম সারাংশমাত্র।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে পদ্মনাথবাবু দ্বারা আমি একখণ্ড পাই এবং অবিকল নকল দেখিয়া মোহিনীবাবুকে পত্র লিখি। আমার ইচ্ছা ছিল যে, ক্ষতির নালিশ করি। কিন্তু পত্রোত্তরে মোহিনীবাবু অতি বিনীতভাবে দোষ স্বীকার করেন এবং লজ্জিত হওয়ার কারণেই আমি আর উচ্চবাচ্য করিতে পারি নাই।

. . .

ঠিক, পূর্ব্বপত্রে আমারই ভ্রম হইয়াছে। বঞ্চিত ঘোষ" নহেন-ঠাকুর জীবনই হইবেন। ইহার সম্বন্ধেই পূর্ব্বপত্র লিখিত বিবরণ . . . বটে। শ্রীহট্ট গবর্ণমেন্ট মহাফেজখানা দেখিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে, জানিয়া থাকিবেন। শ্রাবণ মাসেই আমি তজ্জন্য শ্রীহট্ট যাইব।[১২]

একটা আবশ্যকীয় কথা- ৪।৬।১৮৪৩ তারিখে ৩১৪।১৮৪০।৪৪ ইং নম্বর মকদ্দমা মহারাজা কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে রুজু করেন, ঐ মকদ্দমার দুখানা তাম্রপত্র দাখিল হয়। শ্রীহট্ট হইতে তাহা শিলং নীত হইয়াছে। তাহার নকল পাওয়ার কোন সুবিধা আছে কি? এবং একথাটা সত্য কি? আপনে কি তাহা জানাইতে পারেন?

কিন্তু তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র পীড়াপিড়ি করিতেছি না। সহজসাধ্য হইলে চেষ্টা করিতে পারেন--নতুবা নয়। মনে আছে-- আমরাই নকল পাইবার জন্য দরখাস্ত দিব। ইতিহাস পক্ষে এ দুটি তাম্রপত্রের খুব দরকার।[১৩]

তাড়াতাড়ি জন্য গত পত্রখানি দ্বিতীয় বার পাঠ করিয়া দেখিতে পারি নাই। এইজন্যই ভুল হইয়াছিল।

অত্র মঙ্গল, কুশল জানাইবেন। ইতি

৪ জুলাই

দীন --- শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী

মৈনা

P.S. যদি কোন সুসংবাদ পাইয়া থাকেন, Province হইতে যদি কিছু আসিয়া থাকে-সংক্ষেপে জানাইবেন। ইতি

।। ৩ ।।

শ্রীহরি---

সসম্মান নিবেদন--

আপনার পত্র পাইলাম। আত্মীয়জনের প্রতি যেরূপ করিতে হয়, আপনে ও সারদাবাবু আমার জন্য তাহা করিবার ত্রুটা করেন নাই। অবনত দাসের জন্য যাহা করা উচিত, শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া আমার জন্য তাহা করিয়াছেন। যাহা আশা করি নাই, তাহা করিয়াছেন। . . . যে কিছু হইল না-সে কাহারো দোষ নহে। আমারই কর্ম্মে নাই বলিয়া হইল না। না হ'ক, যখন সে সময় উপস্থিত হইবে, তখন হইবে, এবং তখন আপনাদিগকে পুনর্ব্বার ত্যক্ত করিব। এখন যে কিছু হইল না, তজ্জন্য আপনে বা সারদাবাবু একটুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। শ্রী প্রভুর[১৪] ইচ্ছা নাই-- হইবে কেন? সারদাবাবুর কাছে পৃথক পত্র দিলাম না, তাঁহাকে আমার প্রীতি সম্ভাষণ জানাইবেন। এবং পূজনীয় শ্রীল প্রভুপাদকে আমার দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিবেন।

আপনে ঐতিহাসিক যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে পরম উপকৃত হইয়াছি। আপনার নিকট হইতে এইরূপ আমি আরও প্রত্যাশা করি।

Journal of Asiatic Society তে প্রকাশিত Baron otto Des Granges এর প্রস্তাবের নকল লিখিয়া Book Post এ পাঠাইবেন লিখিয়াছেন। কিন্তু আজও উহা পাইলাম না, না পাঠাইয়া থাকিলে পাঠাইবেন।[১৫]

ইতঃপূর্ব্বে মদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী প্রেরিত খেদা সম্বন্ধীয় যে দরখাস্তের কথা লিখিয়াছিলাম, দুইমাস প্রায় হইয়া গেল, তথাপি তাহার হুকুম হইয়া শিলচারে পুনপ্রেরিত হইতেছে না।

যা হয় --- একটা হুকুম হইয়া যাহাতে সত্বর পুনপ্রেরিত হয়, তাহার কি কোন উপায় নাই? না Remainder দিতে হইবে ? সে বড়ই উৎকণ্ঠিত আছে।

অত্র মঙ্গল, কুশল চাই। ইতি ১০ শ্রাবণ

দীন-- শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি

।। ৪ ।।

To
Babu
Pralhad Chandra Das [১৬]
Shillong

সসম্মান নিবেদন--

আপনার পত্র ও ঐতিহাসিক matter পাইয়া পরম আনন্দিত হইয়াছি। ইতিমধ্যে শ্রীহট্টস্থ শ্রীযুত কেলীশ বাবু[১৭] বলিয়াছেন যে, তিনিও অনেক বিষয় জানাইবেন। তিনি আপনার কাছে পত্র লিখিতে ইচ্ছুক, কিন্তু একান্ত সময়াভাবে লিখিতে পারেন নাই।

গত ৫ই তারিখে c. to e.e.-র কাছে[১৮] অনুরোধপত্র পাঠাইয়াছি। ফলাফল শ্রীপ্রভুর ইচ্ছাধীন। কৃতকার্য হইলে তাঁহারই করুণা ও আপনাদের স্নেহগুণে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে আপনারা আমার জন্য যা করিতেছেন, তাহা ভুলিবার নহে।

আমি মদীয় মাসীর অনুরোধে ও অর্থব্যয়ে বালকপাঠ্য যে সচিত্র বহিখানা ছাপাইয়াছি, তাহার একখণ্ড আপনাকে উপহার দিলাম। ইহা উপহার দিবার উপযোগী নহে। না হোক, আপনারা আত্মীয় স্বজন, আপনাদিগকে না দিলে মনে শান্তি হয় কই?

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রভুপাদকে দিতে সাহস হইতেছে না। অতিরিক্ত এক খণ্ড "বিনোদন চিত্র" দিলাম, আপনে ও সারদাবাবুতে পরামর্শক্রমে যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে আমার দণ্ডবৎ জ্ঞাপনপূর্বক ইহা সমর্পণ করিবেন।

আগামী ৩ ভাদ্র তারিখে আমি শ্রীহট্ট যাইব। ওঁ পূজা পর্যন্ত থাকিয়া মহাফেজখানার কাগজপত্র দেখিব। অতএব এই পত্রের উত্তর ও পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ, "ধুপাদীঘির পার, শ্রীহট্ট, শ্রীরসরাজ উকীলের বাসা" এই ঠিকানায় দিবেন। এবং পূজা পর্যন্ত উক্ত ঠিকানায়ই পত্রাদি লিখিবেন।

বিনোদন চিত্র ৬ খণ্ড ও এক দরখাস্ত শিলং ডাইরেক্টার আফিসে পাঠাইয়াছি। আসামের স্কুল সমূহের নিম্নশ্রেণীগুলিতে ইহা পুরস্কারগ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হয়, ইহার অনুমোদনার্থ প্রার্থনা করিয়াছি। কি আবেদন হয়--জানি না। জ্ঞাতার্থে লিখিলাম।

আপনে ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক উপকরণ যাহা ২ পাঠাইয়াছেন, তাহার জন্য বড়ই উপকৃত আছি। এইরূপ যখন অবসর পান কিছু ২ দিবেন। অত্র মঙ্গল, কৃপা লিখিবেন। ইতি

ভবদীয়

১৩। ৮। ০৪

শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী

পত্র সংখ্যা - ১

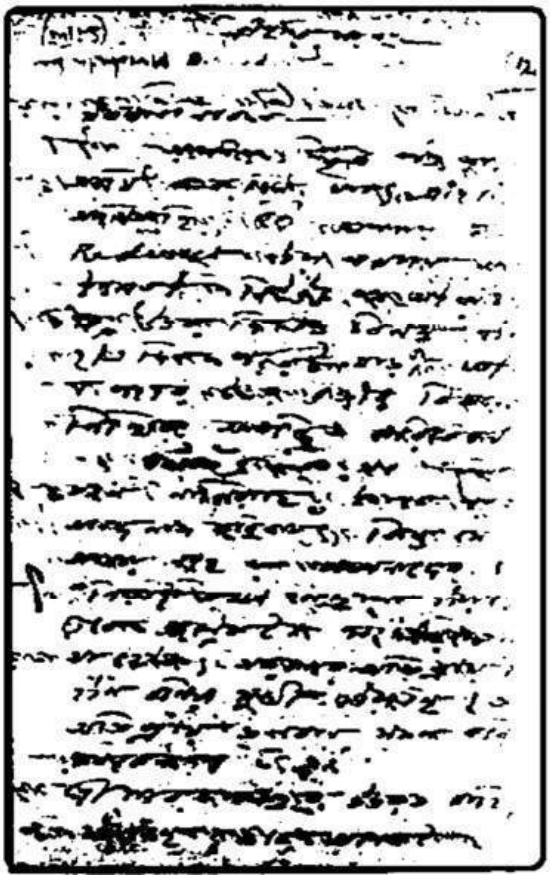

পত্র সংখ্যা - ২

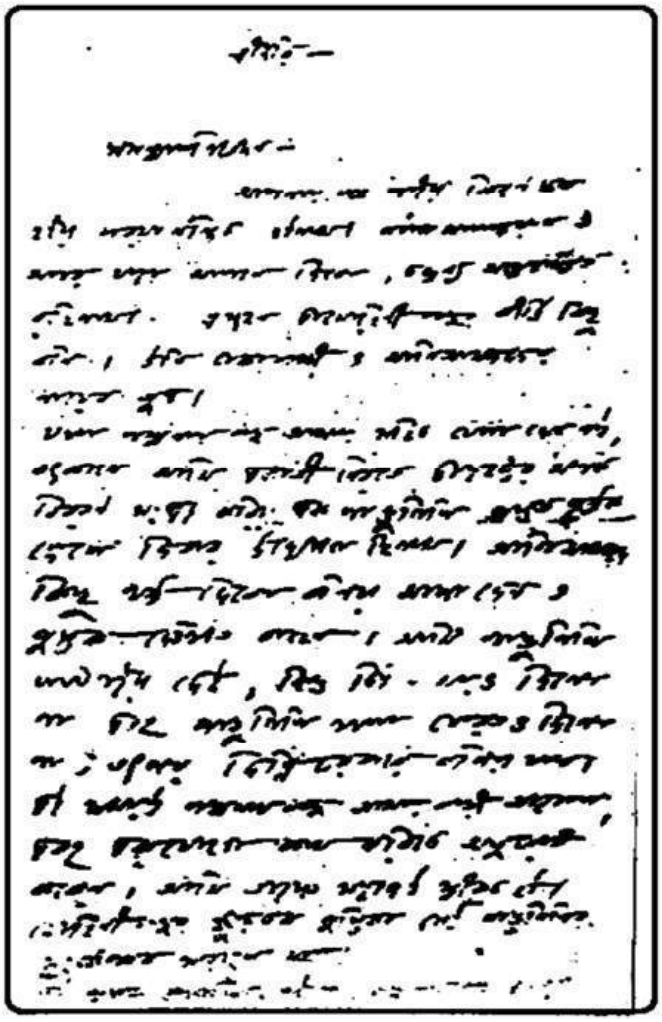

পত্র সংখ্যা - ২

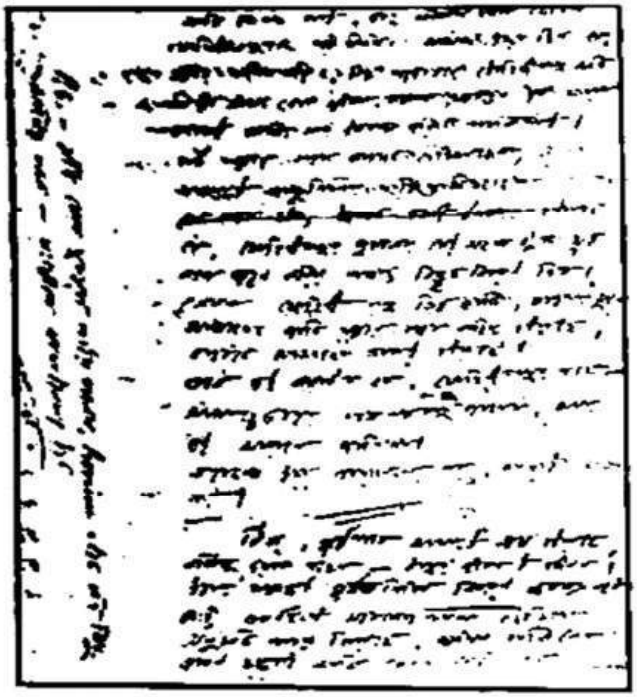

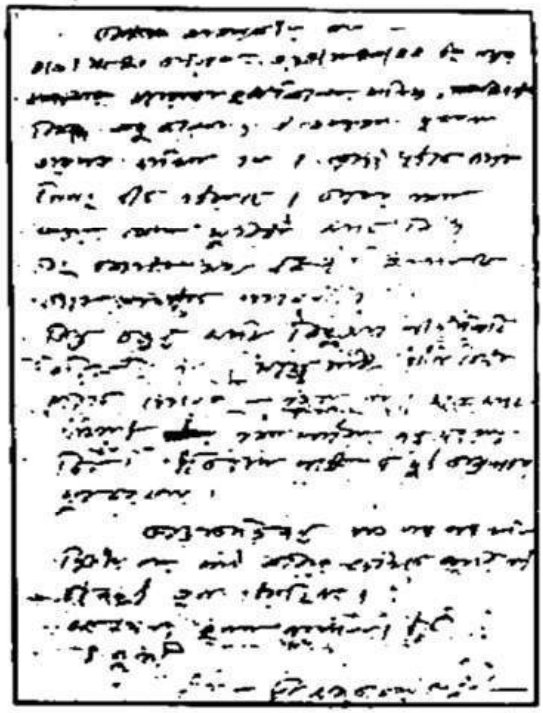

পত্র সংখ্যা - ৩

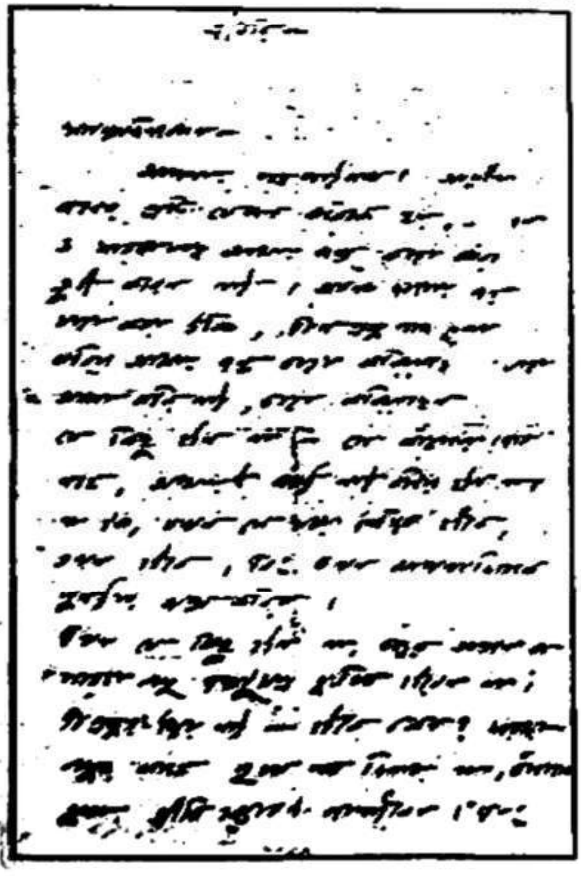

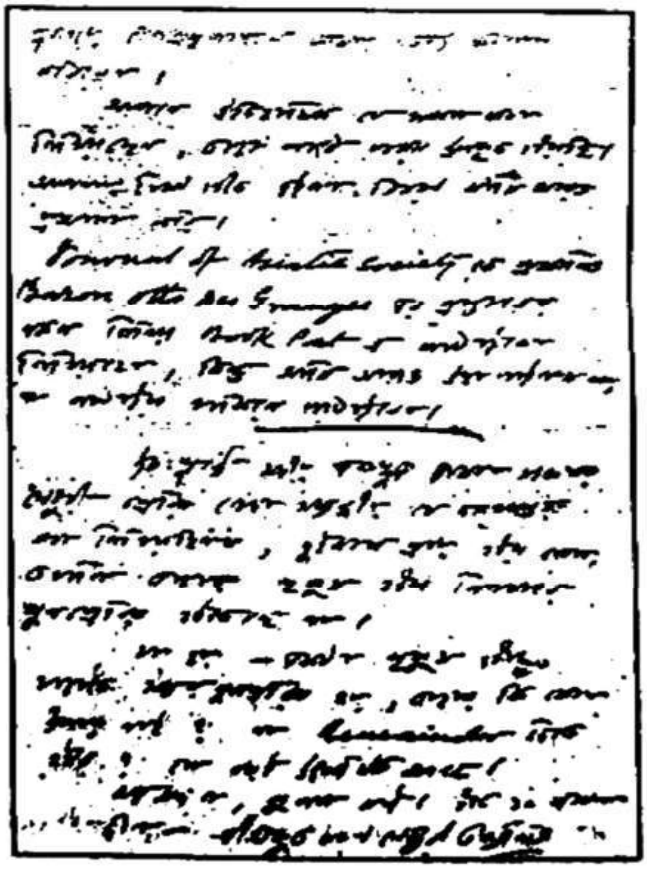

পত্র সংখ্যা - ৪

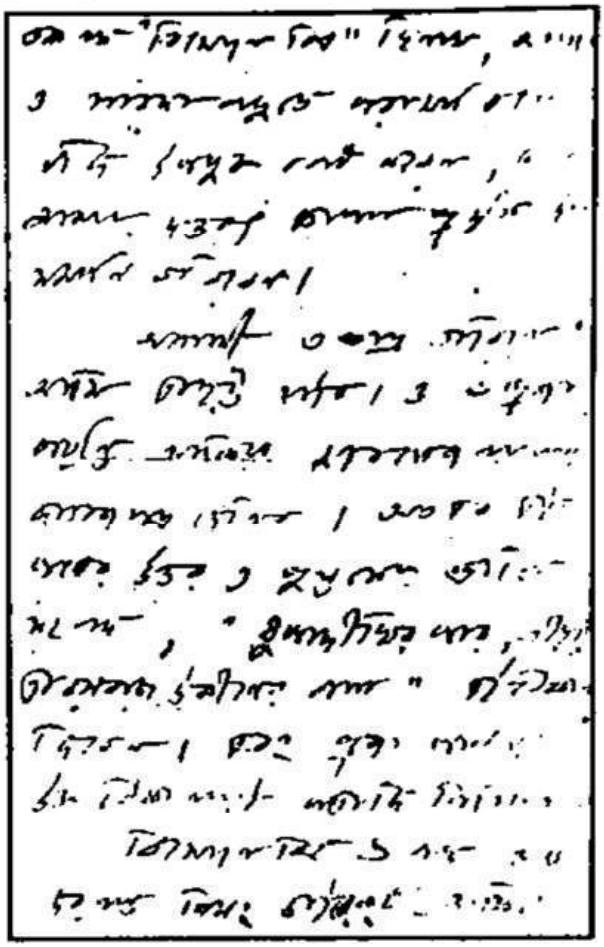

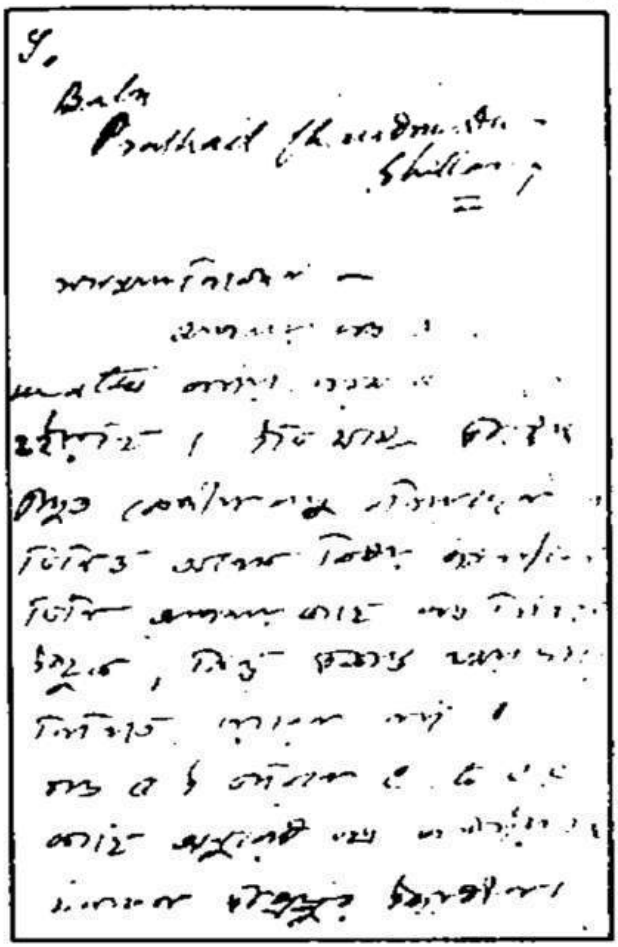

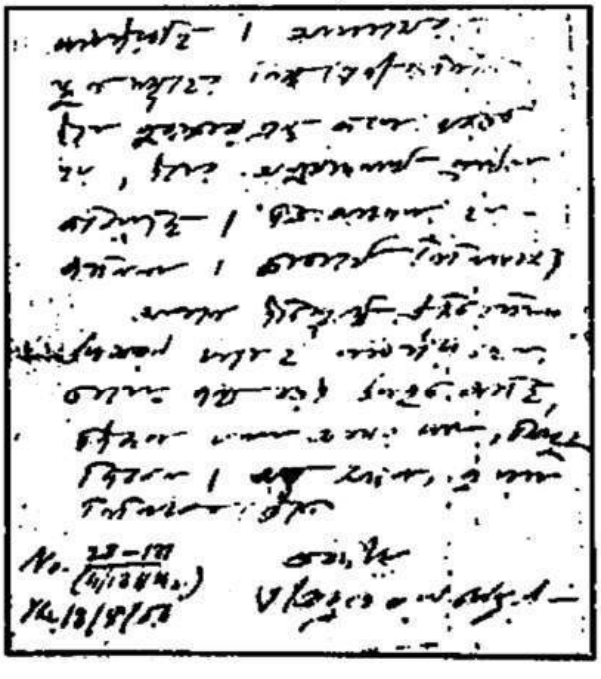

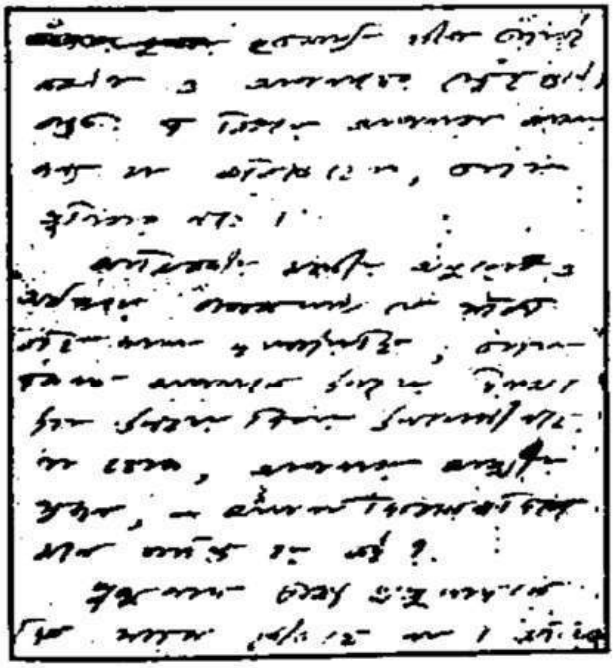

পাদটীকা

১ অচ্যুতচরণের 'শ্রীচৈতন্যচরিত' বালক বালিকাদের পাঠোপযোগী ও সচিত্র বই। ভূমিকায় 'শ্রীগৌরপূর্ণিমা। শ্রীচৈতন্যাব্দ-৪১৯' বলে লেখা আছে। শ্রাবণ, ১৩২০ সালে প্রকাশিত সংস্করণের শেষ পৃষ্ঠায় 'বাঁকুড়াদর্পণ' পত্রিকার ১৩১১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা রয়েছে। সতরাং বইটি ১৩১০ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। এটি লিখে অচ্যুতচরণ তড়াসের ভূমিপতি রায়বাহাদুর বনমালী রায় প্রদত্ত সুবর্ণপদক লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

২ 'নিতাইরমণ' নামক কোনো বইয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় নি। সম্ভবত এটিও বালক-বালিকাদের জন্য রচিত হয়ে থাকবে। অচ্যুতচরণের 'শ্রীশ্রীনিতাইলীলালহরী' ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৩ পদবির উল্লেখ না থাকায় প্রকৃত পরিচয় জানা যায় না। সারদাচরণ শ্যাম (১৮৬২-১৯১৬) সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর কথা বলা হয়ে থাকতে পারে।

৪ অচ্যুতচরণ 'আপনি' না লিখে চিঠিপত্রে 'আপনে' লিখতেন। অবশ্যই আঞ্চলিক কথ্যরীতি ও উপভাষার প্রভাব।

৫ বাণীঠাকুর বা ঠাকুরবাণী বিখ্যাত মহাপুরুষ। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত', উত্তরাংশ, চতুর্থভাগের 'জীবনবৃত্তান্ত' অংশে এই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আছে।

৬ সম্ভবত রঘুনাথ দেব কানুনগুই রচিত 'চরিত্র চিন্তারত্ন' গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে।

৭ শ্রীহট্টের বিখ্যাত জমিদার ও ব্রজবুলি-মিশ্রিত বাংলা ভাষায় রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা বিষয়ক 'দোহাবলী'-র রচয়িতা।

৮ মোহিনীবাবুর নাম উল্লেখ না করে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় অচ্যুতচরণ পৃথিমপাশা থেকে প্রকাশিত 'শ্রীহট্টের ইতিহাস' নামক পুস্তিকার কথা বলেছেন।

৯ শ্রীহট্টের পৃথিমপাশার বিখ্যাত জমিদার (১৮৬৯-১৯০৫)। শ্রীহট্ট শহরের চান্নিঘাটের বিশাল ঘড়ি তাঁরই বদান্যতায় নির্মিত।

১০ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৮-১৯৩৮)। ১৮৮৬ সালের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় আসামের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী ও ইংরাজি সাহিত্যের এম.এ। ১৮৯৩ সালে শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজে প্রথম অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। ১৯২২ সালে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। গুয়াহাটির কটন কলেজে সংস্কৃত ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। 'কামরূপ শাসনাবলী' তাঁর স্মরণীয় সারস্বত কীর্তি।

১১ শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক। শ্রীচৈতন্য-পরিকর বাসুদেব ঘোষের বংশধর। প্রকৃত নাম গঙ্গারাম ঘোষ। বাসুঘোষের মতো তিনিও পদকর্তা ছিলেন।

১২ শ্রীহট্টের তথা সুরমা উপত্যকার ইতিহাস অনুসন্ধানে অচ্যুতচরণ কতটা উৎসাহী ও পরিশ্রমী ছিলেন, এর থেকে তা বুঝতে পারা যায়।

১৩ সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপাদান ও তথ্য যে অচ্যুতচরণ তাম্রপত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে ঝালাই করে নিতেন, এর থেকে সেটা বুঝতে পারা যায়। অচ্যুতচরণের ইতিহাস-জিজ্ঞাসা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে স্বীকার করেই অগ্রসর হয়েছিল।

১৪ ইনি সম্ভবত অচ্যুতচরণের গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ চারুচন্দ্র গোস্বামী।

১৫ এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে প্রকাশিত ঠিক কোন রচনা/প্রস্তাবের জন্য অচ্যুতচরণ আগ্রহী ছিলেন, জানা যায় না।

১৬ প্রহ্লাদচন্দ্র দাস প্রকৃতপক্ষে প্রহ্লাদচন্দ্র সেন পুরকায়স্থ। বৈষ্ণবীয় রীতিতে তখন অনেকেই 'দাস' পদবি ব্যবহার করতেন। অনবধানবশত Prahlad স্থলে Pralhad লিখেছেন অচ্যুতচরণ। প্রহ্লাদচন্দ্র প্রথম জীবনে পুলিস বিভাগে শিলঙে চাকরি করতেন। পরে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ (মহাকরণে) কাজ করেন।

১৭ পরিচয় অজ্ঞাত।

১৮ ঠিক কার কাছে অনুরোধপত্র পাঠানো হয়েছিল, সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে তা পরিষ্কার নয়।

শ্রীহট্ট-কাছাড়ে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে ঐক্যভাবনা

সঞ্জীব দেবলস্কর

শ্রীহট্ট এবং কাছাড়, ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত দুটি অঞ্চলকে একটি শব্দবন্ধে আনতে হচ্ছে এ জন্যেই, 'মমতা বিহীন কালস্রোতে' এ অঞ্চলটি বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা অথচ প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ, প্রাগাধুনিক যুগ পেরিয়ে বর্তমানকালেও এ অঞ্চলটি একটি একক সাংস্কৃতিক মানচিত্রের অন্তর্গত অঞ্চল। ১৮৭৪, ১৯১১ এবং এরপর ১৯৪৭ সালে শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলটিকে বিভাজিত করে, খণ্ডিত করে একটিকে দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানের হাতে, অপর অংশটি ভারতবর্ষে। পাকিস্তানের অধিকারভুক্ত অংশটি বর্তমানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রের অংশ, আর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসীমাভুক্ত অংশটি ভাষিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক দিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রাদেশিক সরকারের অন্তর্গত একটি জেলা, যা আবার বর্তমানে তিনটি পৃথক জেলায় বিভাজিত হয়ে 'বরাক উপত্যকা' অভিধা নিয়ে নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে। ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে, আসাম রাজ্যের মূলভূমি থেকেও ভৌগোলিক ভাবে প্রায় বিচ্ছিন্ন বরাক উপত্যকা না-আসামের-না বাংলার, মূলত এক 'নির্বাসিতা' ভূমি। এ নির্বাসনের অভিশাপে জর্জরিত এ অঞ্চলের সমাজ সংস্কৃতির ওপর কোন অনুসন্ধানে রাজনৈতিক মানচিত্রের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা না করে উপায় নেই, এবং সংক্ষেপে এদিকে একটু আলোকপাত না করলে বাংলাভাষার ভূগোলের অন্যান্য অঞ্চলের পাঠকদের কাছে পুরো ব্যাপারটাই অস্পষ্ট মনে হতে পারে- বিশেষ করে 'শ্রীহট্ট-কাছাড়' শব্দবন্ধটিই জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এ চিন্তাই সম্ভবত পীড়িত করেছিল ইতিহাসবিদ ড. সুজিৎ চৌধুরীকে, যখন তিনি এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন। খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত কালসীমার ইতিহাসে যে-ভূখণ্ডটি ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় ছিল, সে অঞ্চলটি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত; আবার সমাজ ও জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় কাছাড় অঞ্চলটিও যে সামিল ছিল, এ কথাটা ভুলব কী করে? একটি অংশকে ছেড়ে অপর অংশটির সম্যক পরিচয় লাভ অসম্ভব। সুজিৎ চৌধুরী তাই তাঁর গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন 'শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস' (প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২)। আমাদের বর্তমান আলোচনায়ও সেই একই পথে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুখবন্ধে এ কথাগুলো রেখে আমরা এবার যাব মূল প্রসঙ্গে।

দুই

শ্রীহট্ট-কাছাড়ের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' প্রণেতা নীহার রঞ্জন রায়ের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা মেঘনা উপত্যকারই (মৈমনসিং-ত্রিপুরা-ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক

সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে বরং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ববাংলার এই কয়টি জেলার সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট কাছাড়ে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল। এখনও শ্রীহট্ট কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাংলার পূর্বতন জেলাগুলির সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। শুধু তাহাই নয়, লৌকিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনও বাংলার এই জেলাগুলির সঙ্গে।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১৪০০, পৃঃ ৬৯) বরাক-সুরমা উপত্যকা বা শ্রীহট্ট-কাছাড়কে একটি অখণ্ড ইউনিট হিসেবে ধরার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়েরও সমর্থন রয়েছে। এ অখণ্ড অঞ্চলটির লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে অনুসন্ধান করলে আমাদের আশ্চর্য লাগবে যে ঔপনিবেশিক চক্রান্ত, দেশভাগের প্রত্যক্ষ চাপের ভারে জর্জরিত অঞ্চলটির সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামো অত্যাশ্চর্যজনকভাবে সমন্বয়ধর্মী, উদার এবং লৌকিক ধর্মাচার সংস্কার মুক্ত। স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তে গণভোট, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, হানাহানি, দাঙ্গার অভিজ্ঞতার অন্ধকার পথ দিয়ে হেঁটেও বর্তমানে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, এপারে ওপারে রাষ্ট্রীয় মদতে, আন্তর্জাতিক চক্র সমূহের তৎপরতায় অশান্তির আগুনের তাপ বাঁচিয়ে যে অঞ্চলটি এখনও নিজস্ব পরম্পরায় স্থিত আছে- এ অবস্থায় এ অঞ্চলটির লৌকিক সংস্কৃতির দিকে, ঐতিহ্যের উৎসের দিকে একটু ফিরে তাকানোর এটাই সময়।

তিন

শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলটি সাংস্কৃতিক দিকে চৈতন্য-শাহজালালেরই অঞ্চল। চৈতন্য-শাহজালালের পূর্বে এ অঞ্চলটিতে বৌদ্ধ সহজিয়া দর্শন ও সাধনতত্ত্ব প্রচলিত ছিল, এটাও ঐতিহাসিকদের অভিমত। দশম-একাদশ শতকে শ্রীহট্টের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সে যুগের স্বাক্ষরবহনকারী তাম্রপত্রে শ্রীহট্টের 'চন্দ্রপুরী বিষয়া'য় প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে একটি বৌদ্ধ মঠ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া গেছে।[১] তাম্রপত্রের সাক্ষ্য ছাড়াও লৌকিক ধর্মাচারকে বিশ্লেষণ করেও ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন শ্রীহট্টে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বসতি ছিল। সাম্প্রতিক কালে জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য, সুজিৎ চৌধুরী, ভি.এস. আগরওয়াল ছাড়াও ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়, রাজমোহন নাথও এ অভিমত পোষণ করেন। সিলেটের বিশিষ্ট গবেষক মোহম্মদ আশরফ হোসেন সাহিত্যরত্ন-র ভাষায়, "শিলহট্ট (এ) তন্ত্রাচারের যে যে নিদর্শন রহিয়াছে তাহা যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রাধান্যের ফলে এবং পরে হিন্দু কৃষ্টির সহিত মিশিয়া গিয়া শুধু হিন্দু সংস্কৃতিতে পরিণত হইয়াছে, তার প্রমাণের অভাব হইবেনা।[২] নেপাল রাজগ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কৃত 'চর্যাপদে'র ভাষা কিংবা রচনা স্থানের বিবাদে শ্রীহট্টের নামও রয়েছে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর ভ্রাতা সৈয়দ মুর্তাজা আলী 'চর্যাগীতিকার ভাষা' নিবন্ধে এসব পদে ব্যবহৃত অনেকগুলো শব্দকে শ্রীহট্ট অঞ্চলের শব্দ হিসেবে সনাক্ত করেন। বিষয়টি যদিও বিতর্কিত এবং অমীমাংসিত তবুও এ অঞ্চলের বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সূত্র তো এরই মধ্যে নিহিত। আর দশম থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে রাষ্ট্রনৈতিক

পালাবদলের পর্বে কোন পরিস্থিতিতে, কী প্রক্রিয়ায় এরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, এর বিশ্লেষণ করেছেন সুজিৎ চৌধুরী তাঁর Folklore and History: A Study of the Hindu Folkcults of the Barak Valley of Northeast India গ্রন্থে। ধর্মান্তরণের ইতিহাস নয়, নব্য ধর্মান্তরিত মুসলিম এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা থেকে এ অঞ্চলে বিশেষ করে অবিভক্ত কাছাড়ের করিমগঞ্জ মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) একটি সমন্বয়ধর্মী লৌকিক উপাসনা এবং এক লৌকিক উপ-দেবতার (godling) উদ্ভবের প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা যায়। এ প্রসঙ্গে আসার আগে আমরা মধ্যযুগের অপর একটি দিকে একটু দৃষ্টিপাত করে নিতে চাই।

চার

হিন্দু রক্ষণশীলতার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই মধ্যযুগে বঙ্গদেশে সংস্কৃতগ্রন্থ সমূহ, বিশেষ করে মহাকাব্যগুলো 'ভাষায়' অর্থাৎ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এসবের পৃষ্ঠপোষণা করেছেন মুসলিম রাজা বাদশারাও। কাশীরাম দাস কর্তৃক মহাভারত অনূদিত হবার আগেই শ্রীহট্টের কবি সঞ্জয় মহাভারত গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। আসলে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচার প্রচলনের পরও এখানকার লোকধর্ম, লৌকিক আচার আচরণ যথেষ্ট অপরিবর্তিত থেকে যায়। অথবা নিজস্বতা রক্ষা করেই অঞ্চলটি আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার পথে এগিয়েছিল; একই ভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচলনের পরও এখানকার নব্য ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোকধর্মের নির্যাস পূর্বাপরই বহমান থাকে। সে অর্থে শরিয়তি ইসলাম এখানে কোন সময়ই প্রচলিত হয়নি। এজন্যই লৌকিক এবং সামাজিক আচার আচরণে একটি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ চেতনা প্রবাহিত ছিল, এখনও আছে। এ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন :

"বাঙ্গালাদেশে যে মতের মুহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা খাঁটি শরিয়তি অর্থাৎ কোরান অনুসারী ইসলাম নহে। শরিয়তি মত অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে, বাংলাদেশে ইসলামের সুফি মতই বেশি প্রসার লাভ করে। সুফি মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোন বিরোধ হয় নাই। সুফি মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালায় প্রচলিত যোগ-মার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের সঙ্গে একটা আপোস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল, মধ্যযুগে তুর্কী বিজয়ের পর হইতে যে-ইসলাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল তাহা নিজেকে বাঙ্গালার পক্ষে সহজগ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল।"[৫]

শ্রীহট্ট অর্থাৎ সিলেটে হজরৎ শাহজালালের আগমনের পর এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ইসলাম ধর্মগ্রহণের পরও এখানকার লোকধর্ম এবং সামাজিক সংস্কৃতিতে কোন মৌল পরিবর্তন ঘটেনি। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বহিরাভরণের নীচে বাঙালির নিজস্বতা, যা সে সময় থেকেই জাতিগঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুস্পষ্ট অবয়ব ধারণ করার পথে চলছিল, তা অক্ষতই ছিল। আর, যে-মুসলিম সাধকরা এ অঞ্চলে এসেছিলেন, এরা মুখ্যত এনেছিলেন সুফি দর্শন। এ সুফি দর্শন

এসেছে এমন এক ভূখণ্ডে যেখানে ইতিপূর্বে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্বের একটি অধ্যায়ও সবে সমাপ্ত হয়েছে।

আবার এর প্রায় সমসাময়িক কালেই সিলেট-কাছাড়ে এল বৈষ্ণব ধর্মাচারের একটি জোয়ার। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃভূমি হল শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ। যদিও চৈতন্যদেবের মূল কর্মক্ষেত্র শ্রীহট্ট নয়, তবুও শ্রীহট্ট থেকে তিনি পেয়েছেন একাধিক অনুগামী। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব শ্রীহট্টে ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। এখানে সুফিতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব মিলে মিশে এক হয়েছে। এ অঞ্চলে আউল-বাউল-মারফতি এবং পাঁচালি-কীর্তন-দেহতত্ত্বের বিপুল উৎসারণের সূত্র সম্ভবত এখানেই রয়েছে। প্রচলিত সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটার মতো কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি (এটা একান্তভাবেই বিংশ শতাব্দীর অবদান)। বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশের প্রাথমিক পর্ব থেকেই শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠতে থাকে। এ মিশ্র সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতেই লালিত হয়েছে সুফি-মরমিয়া-বৈষ্ণব মতাদর্শ আশ্রিত বাউল ধর্ম, যে ধর্মের মধ্যেই রয়েছে বাঙালির নিজস্বতা। বাউল ধর্ম-সুফি ধর্মই আসলে বাঙালির নিজস্ব ধর্ম (যদি এরকম কোন বাক্য ব্যবহার করা যায়) এবং এ ধর্মের স্বরূপটিই চর্যাপদ থেকে চণ্ডীদাস-লালন-হাসন-রাধারমণ হয়ে নজরুল-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত। এ বাউল তত্ত্বেই হিন্দু-মুসলিম সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এক সাথে মজেছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার আগে ফিরে যেতে চাই ইতিপূর্বে উত্থাপিত শ্রীহট্ট-কাছাড়ের সমন্বয়ধর্মী একটি লৌকিক ধর্মাচারের প্রসঙ্গে।

পাঁচ

বাংলার বিভিন্ন স্থানে পিরের দরগা, মোকাম, মাজার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যেখানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অচার পালন করেন। হিন্দু পরিবারে সত্যপিরের শিরনি চড়ানো এখনও যছেষ্ট জনপ্রিয়। বাঙালিদের ভুবনে সম্ভবত সর্ববৃহৎ দরগাটির অবস্থান এই শ্রীহট্টতেই। এখানে রয়েছে পির শাহজালালের দরগা, যেখানে সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে হিন্দু কিংবা মুসলিম কারোরই যেতে মানা নেই। প্রবল ধর্মপ্রাণা কিংবা তীব্র নাস্তিক্যমনাও এ দরগার আকর্ষণকে এড়াতে পারেন না। এ দরগা ছাড়াও সিলেট শহরের উপকণ্ঠে রয়েছে অনেক মাজার, মোকামবাড়ি যেখানে আউল-বাউল-ফকিরের সূঢ় সাধনা চলছে নিভৃতে, মৌলবাদী, রক্ষণশীল মোল্লা-মৌলবিদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই। পরিসংখ্যান নিলে হয়তো-বা দেখা যাবে মন্দির-মসজিদের চেয়ে দরগা-মোকাম-মাজার-এর প্রতি আস্থাশীল মানুষের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি-অন্তত শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে তো বটেই। সিলেট এবং বরাক উপত্যকায় মোকাম বাড়ি রয়েছে অসংখ্য এবং এগুলোর বেশ কয়েকটি তিনশো চারশো বছর কিংবা এর চেয়েও পুরনো। হজরৎ শাহজালালের সঙ্গে এ অঞ্চলে এসেছিলেন তিনশো ষাট জন

আউলিয়া এবং এ সব আউলিয়াদের কেন্দ্র করেই হয়তো-বা এরকম মোকাম, দরগা, মাজার গড়ে উঠেছে। তবু হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় এবং সহাবস্থানের চরম প্রকাশ ঘটেছে এ অঞ্চলে, বিশেষ করে করিমগঞ্জ, রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি অঞ্চলের 'বাদশার থান' প্রতিষ্ঠায়। আরো বিশেষ লক্ষণীয় যে, এ 'বাদশা'র থানটি অনেকক্ষেত্রেই স্থান পেয়েছে হিন্দুদের কালীমন্দির চত্বরেই। এখানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই অবাধ প্রবেশ। বিষয়টি নিয়ে গভীর অনুসন্ধান করেছেন ঐতিহাসিক সুজিৎ চৌধুরী। তিনি বলেন :

"It is intriguing that Badsah co-exists with Goddess Kali within the very inner campus of Kali temples. Kali is supposed to be the most fierce and malicious of the Hindu divinities and her wrath for heretics and non-believers is well known. How the villagefolk with their simple belief and unqualified regard dare to accommodate a godling of presumed Muslim origin with a definite Muslim name within the abode of Kali is a problem worth investigation."[৬]

স্পষ্টতই ইসলামীয় অনুষঙ্গ সমন্বিত এক লৌকিক দেবতাই হলেন এ বাদশা, যে দেবতার আত্মপ্রকাশের পেছনে কোন মুসলিম ধর্মীয় পুরুষের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিপদসঙ্কুল বনভূমিকে চাষের আওতায় আনতে, অরণ্য-প্রকৃতি-ব্যাঘ্র-শ্বাপদ প্রাণীর কিংবা অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে টিকে থাকবার লড়াইতে এ ধর্মীয় নেতাদের কোন ভূমিকা হয়তোবা ছিল। শাহজালালের অনুগামী আউলিয়াদেরই হয়তোবা একজন সেই মধ্যযুগ থেকে প্রাগাধুনিক যুগের অন্তর্বর্তীকালে মানব থেকে এ লৌকিক দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছেন। ব্যাঘ্রবাহনে এ দেবতা বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ অগম্য স্থলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই একটি ভরসার স্থল ছিলেন এবং তাঁর সামনে নত হওয়ার পথে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু বা মুসলিম ধর্মের কোনও বিধি নিষেধ গ্রাহ্য হয়নি, —আজো হয় না।

শ্রীহট্ট-কাছাড়ে অনাবাদি জমিকে চাষের আওতায় আনতে, অসহায় দুর্বল মানুষকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অস্তিত্বের সংগ্রামে সাহস জোগাতে এ বাদশা উপাসনার একটি ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল। খ্রিস্টপূর্ব শতক থেকে খ্রিস্টীয় শতকের সূচনায় আর্যব্রাহ্মণ্য জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে-অঞ্চলটিতে লাঙ্গল ভিত্তিক চাষ আবাদের সূত্রপাত ঘটে, সে অঞ্চলে আবার চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাদশা বা তৎসমতুল্য লৌকিক উপাসনাকে কেন্দ্র করে নবপর্যায়ে কৃষি-সম্প্রসারণের ব্যাপকতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এখানে লৌকিক ধর্মাচারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে থাকে অর্থনীতি এবং এ অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমিও জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রেরণা হিসেবেই সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ এ উপাসনার জনপ্রিয়তা, যা একবিংশ শতকেও ভারতীয় উপমহাদেশের প্রান্তিক অঞ্চল সমূহে প্রবহমান। এ প্রসঙ্গে অপর একটি আলোচনায় সুজিৎ চৌধুরীর কিছু মন্তব্য এখানে উদ্ধার করা খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন :

" বাংলার লোকায়ত সমাজে পীর-ফকিররা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছেন, এমনতরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় ধর্মীয় সহাবস্থান, সমন্বয় ও সহমর্মিতার একটা পরিবেশই তাঁরা তৈরি করেছেন। এই সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে আবার তাঁরা দেবায়িত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ, উত্তরবঙ্গের সোনা রায় বা সোনাগাজি এবং আমাদের বাদশা তার দৃষ্টান্ত। আমাদের বরাক উপত্যকায় পীরের থান, মাজার বা মসজিদের পাশাপাশি মন্দিরের সহাবস্থানের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। করিমগঞ্জ জেলার কোন কোন অঞ্চলে দেবস্থানকে যে মোকাম বলা হয়, তার মধ্যেও এই সহবস্থানের ইঙ্গিত রয়েছে।"[৭]

ছয়

আমরা ইতিপূর্বে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে সুরমা-বরাক বা শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে বাউল গানের প্রতি আবেগের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলাম। বাংলার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে যেমন বীরভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলকে বাউল অঞ্চল, কুষ্টিয়াকে লালন, উত্তরবঙ্গকে ভাওয়াইয়া অঞ্চল, তেমনি শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলটিকেও ভাটিবাউল অঞ্চল বলা যায়। অথবা কেন্দ্রভূমিতে দুইজন ব্যক্তিকে যদি স্থাপন করি, তবে এ অঞ্চলটিকে 'হাসন-রাধারমণ' অঞ্চল বলাও খুব সঙ্গত হবে। শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে এমন কোন গ্রাম, শহর বা জনপদ নেই যেখানে 'ভাইরে রাধারমণ বলে', কিংবা 'এই ভাবিয়া হাসন রাজা' ধরনের ভণিতা-যুক্ত পদের উচ্চারণ মানুষকে সচকিত করে না। হাসান রাজার সমসাময়িক রাধারমণের কয়েকটি পদ বাংলা ভাষার তিনটি ভুবনেই বিখ্যাত : '—নিশীথে যাইও ফুলবনে ভ্রমরা', 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে', 'আসবে শ্যামকালিয়া', 'কুঞ্জ সাজাও গিয়া'। তবে বিখ্যাত গায়কদের কণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত এসব গানের পাঠের সঙ্গে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত পাঠের বিস্তর তফাৎ রয়েছে। এ অঞ্চলটিতে আবহমান কাল থেকেই মরমিয়া পির, ফকির, আউল, বাউল কিংবা বোষ্টম গোঁসাই শুনিয়ে আসছেন প্রেমের গান। সুরমা-কুশিয়ারা-বরাক-ধলেশ্বরী-জিরি-চিরি-রুক্ষিশী-সোনাই-মধুরা-জাটিঙ্গার ঢেউয়ে ভেজা সবুজ কান্তারে হাসন-রাধারমণ-সৈয়দ শাহনূর-আবজল-আরকুম শাহ-ইরপানশাহ-শীতালংশাহ-শেখ ভানু-একলিম রাজা-দীন ভবানন্দ-দ্বিজ দাস-শরৎ বাউল থেকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস-গুরুসদয় দত্ত-বিপিন পাল-আমিনুর রশীদ চৌধুরী-আব্দুল গফুর দত্ত চৌধুরী-শাহ আব্দুল করিমের পদ আজো জনপ্রিয়। কোন আনুষ্ঠানিকতা, কোন উপলক্ষের অপেক্ষায় না থেকেই প্রাণের টানে গ্রামীণ জনজীবনে এদের পদ চর্চিত হয়, যে সব পদে সততই উচ্চারিত হয় মানুষের অন্তর্নিহিত মানবসত্তার অন্বেষণ; প্রেমের, মৈত্রীর কিংবা আশাভঙ্গ-জনিত দুঃখবোধের কথাও।

এসব পদাবলীর উৎসে রয়েছে মিলনের তত্ত্ব। হিন্দু-মুললিম উভয় সম্প্রদায়ের সমন্বয় সূত্র থেকেই উৎসারিত এ অঞ্চলের বাউল সংস্কৃতি। বাংলার বাউল সমন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাক্যগুলি অত্যাশ্চর্যজনকভাবে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের বাউল পদর্কতাদের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। তিনি যেন হাসন রাজা সহ আরো অর্ধশতাধিক মুসলিম ধর্মাবলম্বী বৈষ্ণব পদকর্তা[৮] এবং

প্রেমধর্মে অনুপ্রাণিত হিন্দু পদকর্তাদের স্মরণ করেই বলেছেন :

"বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি- এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই; একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়নি; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সবল। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরাণ পুরাণে ঝগড়া বাঁধেনি।"[৯]

কবিগুরু তাঁর The Religion of Man শীর্ষক হিবার্ট বক্তৃতায় সিলেটের মরমি কবি হাসন রাজার উল্লেখও করেছেন। এ হাসন কখনো কৃষ্ণ, কখনও বাহ্যজ্ঞান রহিত, ফানাফিল্লা দশা বাউল, কখনো বা মুর্শিদ। ইসলামি সাধনতত্ত্ব, সুফি দর্শন, বৈষ্ণব তত্ত্ব, বাউল তত্ত্ব হাসনের পদে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। হাসন রাজা কৌতুক ভরে উচ্চারণ করেন :

কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে?
রঙ্গে রঙ্গিলা কানাই--

কৌতুক থেকে আবার পৌঁছে যান গভীর আধ্যাত্মিক মার্গে :

হাসন রাজায় জিজ্ঞাস করে
কানাই বা কোন জন,
ভাবনা চিন্তা কইর‍্যা দেখি
কানাই যে হাসন।

পরমসত্তার অনুসন্ধানে হাসন ফিরে আসেন নিজের কাছেই :

মুর্শিদ আমি খুঁজব না গো
বনে জঙ্গলে যাইয়া
আমার মাঝে আমার মুর্শিদ
আছেরে পথ চাইয়া।

তাছাড়াও, রাধাকৃষ্ণের প্রেমে মাতোয়ারা হাসন রাজা গান বেঁধেছেন 'কালা কাজলের বাঁশি দেইখ্যা আইলাম সই', 'আমার বন্ধু আইন্যা দে, প্রাণ ললিতে'। এসব পদের আবেদন কি সাম্প্রদায়কতার ক্ষুদ্রগণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখা যায়?

এ প্রসঙ্গে আলোচনার আর বিস্তার না ঘটিয়ে কয়েকটি সংগৃহীত পদের কলি উদ্ধার করা যেতে পারে। শীতালংশা গেয়েছেন :

দূতী গো, আমার প্রেমরসে ভাবটিতে
না হইল শৃঙ্গার।

সুরজ আলী গেয়েছেন :

বন্ধু রসরাজ কালিয়া

মম কুঞ্জে আওরে বন্ধু
কলঙ্কী জানিয়া।

কৃষ্ণের গোষ্ঠ লীলার অনুষঙ্গ এসেছে ছয়ফুল মিঞার একটি পদে :

তুমি তো গরুরো রাখাল
মাঠে মাঠে থাকো
বাঁশরি বাজাইয়া পালের
গরু বাছুর রাখ রে
প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধু রে।

সাত

ভাটি বাউলদের কণ্ঠে যে কেবল আধ্যাত্মিকতা, দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্বই ধ্বনিত হয়েছে তা নয়, বিশেষ বিশেষ সময়ে সমাজ-বাস্তবতাও এসব বাউলদের গানের কলি হয়ে ফুটে ওঠেছে। আমরা দেখেছি ঊনবিংশ শতকে শীতালংশা সমাজের এক অদ্ভুত আধাঁর দেখে বিপন্ন হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন :

উঠান ঠন, ঠন, উঠান ঠন, ঠন,
পিড়া (পিড়ি) নিল হুতে (স্রোতে)
গঙ্গা মইলা (মরলেন) জল তিরাসে (তৃষ্ণায়)
বরমা (ব্রহ্মা) মইলা শীতে-
-তোমরা শুনছনি গো,
শুনছনি গো মাই বইন (মা-বোন)
কলায় বাদুড় ধরি খাইতে।

আর, এর একটি শতাব্দী পর যখন ধর্মীয় সংকীর্ণতা, মানবতাদের অবমাননা, প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িকতা বাঙালিকে নবপর্যায়ে খণ্ডিত করার আয়োজন পূর্ণ করে ফেলেছে, তখন সিলেটের বাউল শাহ করিম গাইলেন :

গ্রামের নওজোয়ান, হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাংলা ঘাটু গান গাইতাম,
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।
... ...
হিন্দু বাড়িন্ত যাত্রাগায়েন হইত
নিমন্ত্রণ দিত, আমরা যাইতাম—
কেবা মেম্বার, কে বা মিনিস্টার

এই সব কথা কি আমরা আগে জানিতাম—
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।

এ বাউল (জন্ম ১৯১৫) সাম্প্রদায়িক-রাজনীতির অভিশাপে পীড়িত বাঙালির কাছে অবিরাম গান গেয়ে সম্প্রীতির বাণী ছড়িয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষে বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মস্থান আক্রান্ত হবার পর সম্প্রীতির বাতাবরণ আঘাতপ্রাপ্ত হলেও, একদিকে মুসলিম আতঙ্কবাদ অপরদিকে হিন্দু মৌলবাদের সদম্ভ আত্মপ্রকাশের পরও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের মানুষ শাহ করিমের সম্প্রীতির বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। একদিকে বাঙালিদের বাউল গান, ঘাটু গানের সেই দিনগুলোর জন্য গভীর মর্মবেদনা জাগিয়ে, অপরদিকে চৈতন্য-শাহজালাল, হাসন-রাধারমণের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁদের নিজ স্বভাবধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই যেন চলেছেন আজকের দিনের এ বাউল। শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে এ মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি পদে এখানকার লোকায়ত জীবনের ঐক্যের সুরটি ধরা পড়েছে। আলোচনার সমাপ্তিতে এ পদটিকেই উদ্ধার করা যেতে পারে :

আমার এক কিনারে শাহজালাল,
আর কিনারে নিমাইচাঁদ
নদীর নামটি সুরমা
আর সিলট জিলার নাম--
আমার জনম সিলট
মরণ সিলট,
সিলট গলার মালারে--
সিলট ভূমিরে
বাবা শাহপরানর দেশ
সিলট ভূমি রে।।
বাবা শাহজলালর দেশ
আইছি সিলট, যাইমু সিলট, সিলট থাকমু শুইয়া
যে মাটিত ঘুমাইয়া আছইন তিনশো যাইট আউলিয়া--
কান্দিয়া যে মাটিতে ঘুমাই হাসন রাজা
তার কান্দনে আইজও কান্দে রাইতর চন্দ্র তারা।
কান্দে আরকুম, শীতালংশা
কান্দে রাধারমণরে—
বাবা শাহজলালর দেশ
বাব শাহ পরানর দেশ
বাবা শ্রীচৈতন্যর দেশ

সিলট ভূমিরে।।

সূত্র ও টীকা

১ J.B. Bhattacharjee, Social and Polity Formation in Pre-Colonial North-east India: Barak Valley Experience, New Delhi, 1991, p.24.

২ আবুল বশর, 'সিলেটে বাংলা সাহিত্যচর্চা', প্রাচীন ও মধ্যযুগে বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, সিলেট, ১৯৯৭ গ্রন্থে সংকলিত নিবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ. ৩০২।

৩ ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ আয়োজিত সভায় প্রদত্ত লিখিত প্রতিবেদন।

৪ এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্যের জন্য সুজিৎ চৌধুরীর 'প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য, কিংবদন্তীর পুনর্বিচার', (প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯০) বইটি দ্রষ্টব্য।

৫ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, কলকাতা, পৃ. ১০।

৬ Sujit Choudhury, Folklore and History: A Study of the Hindu Folkcults of the Barak Valley of Northeast India, New Delhi, n.d., p.59.

৭ সুজিৎ চৌধুরী, 'সুলতানী আমলের একটি অনালোচিত লিপি', গবেষণা পরিষদ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর।

৮ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁর 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থে একশ বিশ জন পদর্কতার মধ্যে চৌষট্টি জনকেই শ্রীহট্টের পদর্কতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীত চিন্তা, কলকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ৩১৩।

বরাক উপত্যকার কৃষি অর্থনীতি

নিরঞ্জন রায়

ভূমিকা : আসামের কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি: এই তিন জেলা নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকা। ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই উপত্যকায় ২৯.৮৯ লক্ষ মানুষের বসবাস, যা গোটা আসামের ১১.২ শতাংশ। এই উপত্যকার উত্তরাংশে রয়েছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে মণিপুর রাজ্য, দক্ষিণে মিজোরাম, দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে বাংলাদেশ।

বরাক উপত্যকার অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক এবং জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি কৃষি-নির্ভর। যদিও এই উপত্যকায় কিছু কিছু ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছে, যেমন, চা-শিল্প, কাগজকল, চিনিকল, সিমেন্ট কারখানা ইত্যাদি; কিন্তু এই উপত্যকার আপেক্ষিক ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বৃহৎ শিল্পায়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলত কৃষি এবং কৃষি সম্বন্ধযুক্ত কর্মতৎপরতার ওপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কৃত্রিম উৎপাদন-প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক দিয়ে এই উপত্যকা এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

এই প্রবন্ধে কৃষির সামগ্রিক পরিস্থিতি-নির্ধারক কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং বরাক উপত্যকায় এগুলির সামগ্রিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষিযোগ্য ভূমি : ১৯৯৭-৯৮ সালের আসাম সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব অনুযায়ী এই উপত্যকায় ২,২২,৮৭২ হেক্টর জমি উৎপাদনযোগ্য ছিল, যা গোটা উপত্যকার ভৌগোলিক সীমার ৩২.২৫ শতাংশ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাথাপিছু চাষযোগ্য (Landholding pattern) জমির পরিমাণ গোটা আসামে সমগ্র দেশের তুলনায় অনেক কম। ১৯৯০ সালের কৃষি সমীক্ষা অনুযায়ী মাথাপিছু পাট্টা নেয়া কৃষিযোগ্য জমি আসামে ছিল ১.৪৬ হেক্টর, যা পাঞ্জাবে ৩.৮৫, গুজরাটে ৪.৪৯, অন্ধ্রপ্রদেশে ২.৮৭ এবং সমগ্র দেশে ২.৬৩ হেক্টর। বরাক উপত্যকার পরিস্থিতি সমগ্র আসামের সাথে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কিছুটা গোটা আসামের তুলনায় বেশি বলা যায়। কৃষি সমীক্ষা অনুযায়ী এই উপত্যকায় কৃষিযোগ্য পাট্টা-নেয়া জমির পরিমাণ ছিল ২,০৯৮৭৫ হেক্টর, যা মাথা পিছু দাঁড়ায় ১.৬২ হেক্টর এবং এই হিসাব গোটা আসামের ১.৪৬ হেক্টর থেকে কিছুটা বেশি। ১৯৯৭-৯৮ সালের হিসাবে মোট ২৯৯১৯ হেক্টর জমিতে কৃষি উৎপাদন করা হয়েছিল। নিম্নে উল্লেখ করা সারণি ১-এ ১৯৯৭-৯৮ এর হিসাবে বরাক উপত্যকায় ভূমির ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

সারণি - ১

বরাক উপত্যকার ভূমির ব্যবহার (১৯৯৭-৯৮ এর হিসাব অনুযায়ী)

শ্রেণী বিভাগ	সীমা (হেক্টর হিসাবে)	বিবরণ প্রাপ্ত সীমার অংশ (শতকরা হিসাবে)
১। ভৌগোলিক সীমা	৬৯২২০০	------
২। বিবরণ প্রাপ্ত সীমা	৬৯১০৯৭	১০০.,০
(ক) বনাঞ্চল	২৬১৭৪১	৩৭.৮৭
(খ) কৃষি ব্যবহারের অনুপযুক্ত	১৩২৫৮৬	১৯.১৮
(গ) কৃষি ছাড়া অন্যান্য ব্যবহার যোগ্য	৪৪৩১৭	৬.৪১
(ঘ) পতিত জমি	২৮৩৯০	৪.১১
(ঙ) বীজ বপনযোগ্য জমি	২২৪০৬৩	৩২.৪৩
(চ) শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত জমি	২৯৯১৯	------
(ছ) একবারের বেশি বীজ বপন করা জমি	৭৫১২৮	------

উৎস : Basic Agricultural Statistics, 1998-99, Directorate of Agriculture, Government of Assam.

শস্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া : বরাক উপত্যকা মূলত এক শস্য উৎপাদন বিশিষ্ট অঞ্চলগুলির অন্যতম। এই উপত্যকার প্রধান কৃষি উৎপাদন হল ধান। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৭১-৭২ সাল থেকে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত ধান উৎপাদনশীল জমির পরিমাণ মোট শস্য উৎপাদনশীল জমির ৯২ থেকে ৯৫ শতাংশের মধ্যে ছিল।

ধান, যা এই উপত্যকার শস্য উৎপাদনে আধিপত্য বিস্তার করে আছে, ঋতু অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত হতে পারে। যেমন, শরৎ ঋতুর ধান (autum paddy), শীতঋতুর ধান (winter paddy) এবং গ্রীষ্মকালের ধান (summer paddy)। বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রে শীতঋ তুর ধান বলতে স্থানীয় লোকেদের কাছে পরিচিত 'শাইল' (শালি) ধানকেই বোঝায়। এই ধানের বীজ অন্যত্র বপন করে চারা উৎপাটিত করে শস্যক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। 'শাইল' ধান সাধারণত জুলাই বা আগস্ট মাসে চারাক্ষেত্র থেকে উৎপাটিত করে রোপণ করা হয়। এবং নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে ফসল কাটা হয়। শীতঋতুর ধানের মধ্যে স্থানীয় ভাবে পরিচিত 'বিরইন' (বিন্নি)

ধান এই উপত্যকার নিচু অঞ্চলে উৎপাদন হয়। এই ধান মার্চ বা এপ্রিল মাসে রোপণ করে জুলাই বা আগস্ট মাসে ফসল সংগৃহীত করা হয়। গ্রীষ্মকালের ধান সাধারণত নিম্নভূমিতে শুষ্ক বা বৃষ্টিহীন অবস্থায় উৎপাদন হয়। এই ধানের উৎপাদন প্রক্রিয়া নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। স্থানীয় কৃষকদের গ্রীষ্মকালের জনপ্রিয় ধান হল 'বরুয়া' ধান।

এই তিন প্রকার ধানের মধ্যে শীতঋতুর ধানই এই উপত্যকায় বিশেষ স্থান দখল করে আছে। যেমন, ১৯৯৮-৯৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ধান উৎপাদন করা জমির মধ্যে শীতঋতুর ধানের জমির পরিমাণ ছিল ৮২.৩১ শতাংশ, শরৎঋতুর ধান ১২.০৮ শতাংশ এবং গ্রীষ্মকালের ধান ৫.৬১ শতাংশ। ১৯৭১-৭২ সালে শীতঋতুর ধানের জমির পরিমাণ ছিল ৭৬.৩৭ শতাংশ, শরৎঋতু ও গ্রীষ্মকালের ধানের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭.৭২ এবং ৫.৯১ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, শীতঋতুর ধানের জমির পরিমাণ অনেকটাই বেড়েছে এবং শরৎঋতুর ধানের জমির পরিমাণ ১৭.৭২ শতাংশ থেকে কমেছে ১২.০৮ শতাংশে। অন্যদিকে গ্রীষ্মঋতুর ধানের জমির পরিমাণ ৫ শতাংশে স্থিতাবস্থায় আছে। এই পরিসংখ্যান সমগ্র দেশ, এমন কী গোটা রাজ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বলা যায়। গোটা আসাম রাজ্যের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গত বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ গ্রীষ্মঋতুর ধানের জমির পরিমাণ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শীতঋতুর ধানের জমির পরিমাণ কমেছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত কয়েক বৎসর যাবৎ আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ব্যক্তিগত ও সরকারি খণ্ডে জলসেচ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। অন্যদিকে বরাক উপত্যকায় জলসেচ ব্যবস্থার তেমন কোনো উন্নতি ঘটেনি। বরঞ্চ অবনতি হয়েছে বলা যায়। কেননা, অনেক ছোট ছোট জলসেচ প্রকল্প বিকল হয়ে আছে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি সেখানে গ্রীষ্মঋতুর ধানের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালের হিসাবে যেখানে বরাক উপত্যকায় গ্রীষ্মকালের ধানের জমির পরিমাণ ছিল ৫ শতাংশ, সেখানে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এর পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ শতাংশ। শীতঋতুর ধান সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টি-নির্ভরশীল। তাই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির প্রভাবে গ্রীষ্মকালের ধানের জমির বৃদ্ধির সাথে সাথে শীতঋতুর ধানের জমির পরিমাণ কমে যায়। বরাক উপত্যকায় যেহেতু জলসেচ ব্যবস্থার কোনো বিকাশ হয়নি তাই এখানে শীতঋতুর ধান, অর্থাৎ বৃষ্টি-নির্ভরশীল কৃষি উৎপাদনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎপাদন বিকল্প।

অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের মধ্যে সরিষাদানা, ডাল, আলু, ইক্ষু এবং শাকসব্জির চাষ এই উপত্যকার অন্যতম উৎপাদন। সারণি-২ এ বরাক উপত্যকায় প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদনের বিবরণ দেওয়া হল।

সারণি - ২

বরাক উপত্যকার প্রধান খাদ্যশস্য সমূহ এবং মোট শস্য উৎপাদন ভূমিতে এগুলির শতকরা হিসাব (১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত)

খাদ্যশস্য	১৯৭১-৭২	১৯৭৯-৮০	১৯৯১-৯২	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৮-৯৯
শরৎঋতুর ধান	১৬.৫৫	১৯.৩৬	১২.৮৫	১১.২০	৮.৭৮
শীতঋতুর ধান	৭১.৩২	৬৮.৪০	৭৩.৭৪	৭৬.৩০	৭৯.০১
গ্রীষ্মঋতুর ধান	৫.৫২	৪.৯৪	৬.০৫	৫.২০	৪.৭৬
মোট ধান	৯৩.৩৯	৯২.৭০	৯২.৬৪	৯২.৭০	৯২.৫৫
অন্যান্য খাদ্য শস্য	০.১৫	০.২০	০.১১	০.০৬	০.০৬
ডালজাত শস্য	০.৮০	০.৯৩	১.৪০	২.৩৬	১.৬৬
মোট শস্য দানা	০.৮২	১.০০	২.০৪	১.২০	১.১৪
মোট আঁশ জাতীয় শস্য	০.৫০	০.৩৫	০.১৭	০.১৫	০.১৬
আলু	১.১৩	১.১১	১.৫৭	১.৬৩	১.৭৬
ইক্ষু	২.১২	২.৭৬	১.২৬	১.১৭	১.৭৮
অন্যান্য	১.০৯	০.৯৫	০.৮১	০.৭৩	০.৮৯
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

* বাগানজাত, যেমন চা এবং বৃহৎ গাছ বিশিষ্ট শস্য, যেমন কলা, নারকেল ইত্যাদি হিসাব বর্হিভূত।

উৎস

1) Estimates of Area, Production and Average Yield of Principal Crops in Assam from 1951-52 to 1987-88. Directorate of Economics and Statistics, Government of Assam.

2) Basic Agricultural Statistics, Directorate of Agriculture, Government of Assam, Various issues (1989-90 to 1999-2000)

ধানের তুলনা মূলক উৎপাদন (বরাক উপত্যকা, আসাম এবং সর্বভারতীয় হিসাবে) : কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগের পরিসংখ্যান থেকে বরাক উপত্যকা,

আসাম এবং সর্বভারতীয় ধানের উৎপাদনের তুলনামূলক হিসাব বিশ্লেষণ করা যায়। উক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত বরাক উপত্যকার ধানের গড় উৎপাদন গোটা আসাম থেকে কিছুটা বেশি হলেও সমগ্র আসাম তথা বরাক উপত্যকার পরিস্থিতি সর্বভারতীয় তুলনামূলক হিসাবে অনেক নিম্নে। বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং হ্রাসের গড় সর্বভারতীয় উৎপাদনের তুলনায় ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫৫ শতাংশ থেকে ১১.২ শতাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, বরাক উপত্যকার কৃষি উৎপাদন যেহেতু সম্পূর্ণই বৃষ্টি-নির্ভরশীল তাই যে সমস্ত বৎসরগুলিতে ভালো বৃষ্টিপাত হয় সে সময় ধানের উৎপাদন সর্বভারতীয় গড় উৎপাদন থেকে বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই বিশ্লেষণ থেকে বরাক উপত্যকার কৃষি উন্নয়নে জলসেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সারণি-৩ এ সর্বভারতীয় ক্ষেত্র, আসাম এবং বরাক উপত্যকায় ধানের উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

সারণি -৩

সর্বভারতীয়, আসাম এবং বরাক উপত্যকায় ধানের তুলনামূলক উৎপাদনের গড় হিসাব (১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত)

বৎসর	ধানের উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)			**বরাক উপত্যকার উৎপাদন সর্বভারতীয় উৎপাদনের শতকরা গড় হিসাবে**	**বরাক উপত্যকার উৎপাদন আসামের উৎপাদনের শতকরা গড় হিসাবে**
	বরাক উপত্যকা	আসাম	সর্বভারত		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯৭৭-৭৮	১২৩৮	১০৩৪	১৩০৮	৯৪.৬৫	১১৯.৭৩
১৯৮০-৮১	১৪৯৭	১১২০	১৩৩৬	১১২.০৫	১৩৩.৬৬
১৯৮১-৮২	৯১০	১০০৬	১৩০৮	৬৯.৫৭	৯০.৪৬
১৯৮২-৮৩	১২৭৬	১১৩০	১২৩১	১০৩.৬৬	১১২.৯২
১৯৮৩-৮৪	১২৩৬	১১৪৫	১৪৫৭	৮৪.৮৩	১০৭.৯৫
১৯৮৫-৮৬	১২৪১	১১৭৩	১৫৫২	৭৯.৯৬	১০৫.৮০
১৯৮৭-৮৮	১৫৫৬	১১৮০	১৪৬৫	১০৬.২১	১৩১.৮৬
১৯৮৯-৯০	৯৬৩	১১৩৫	১৭৪৫	৫৫.১৯	৮৪.৮৫
১৯৯০-৯১	১৩৮৭	১২৯২	১৭৪০	৭৯.৭১	১০৭.৩৫
১৯৯১-৯২	১৬৩৪	১২৯০	১৭৫১	৯৩.৩২	১২৬.৬৭
১৯৯৪-৯৫	১৬৭৭	১৩৫০	১৯২১	৮৭.৩০	১২৪.২২

উৎস

1) Estimates of Area, Production and Average Yield of Principal Crops in Assam from 1951-52 to 1987-88, Directorate of Economics and Statistics, Government of Assam.
2) Basic Agricultural Statistics, Directorate of Agriculture, Government of Assam, Issues (1988-89 to 1995-96)
3) Agricultural Statistics at a Glance, Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Government of India, 1997.

অতি উৎপাদনশীল বীজ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার : বরাক উপত্যকায় দেখা যায় যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসূত বীজের (Hyvs) চাষ এখনও খুব একটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত অতি উৎপাদনশীল বীজ চাষের জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.৯৭ শতাংশ থেকে ৫৩ শতাংশ। অথচ সর্বভারতীয় পরিসংখ্যানে এর পরিমাণ ৮০ শতাংশের বেশি। যদিও গোটা আসামের পরিস্থিতিও খুব একটা সন্তোষজনক নয়। গোটা আসামের ১৯৯৮-৯৯ সালের হিসাবে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় বরাক উপত্যকা সর্বভারতীয় হিসাব থেকে অনেক পিছিয়ে। বরাক উপত্যকায় ১৯৯৮-৯৯ সালের হিসাবে দেখা যায় প্রতি হেক্টর জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০ কেজি যা সর্বভারতীয় হিসাবের মাত্র এক চর্তুথাংশ। এক্ষেত্রে গোটা আসামের পরিস্থিতিও বরাক উপত্যকার হিসাবের কাছাকাছি।

জলসেচ ব্যবস্থার বিকাশ : বরাক উপত্যকার জলসেচ ব্যবস্থার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে এক নিরাশাজনক চিত্র ফুটে ওঠে। পরিসংখ্যানে ১৯৯৮-৯৯ সালের হিসাবে দেখা যায়, এই উপত্যকার কৃষিযোগ্য জমির মাত্র ৫ শতাংশ জলসেচের আওতায়। বরাক উপত্যকায় বড় আকারের কোন জলসেচ প্রকল্প নেই। ছোট এবং মাঝারি আকারের জলসেচ প্রকল্পগুলির বেশির ভাগই নদীর জলের উৎসের ওপর নির্ভরশীল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গত কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যক্তিগত খণ্ডে বেশ কিছু মাঝারি এবং ছোট জলসেচ প্রকল্পের বিকাশ ঘটেছে মূলত নলকূপের জলের উৎসের ওপর ভিত্তি করে। বরাক উপত্যকায় নলকূপ ভিত্তিক জলসেচ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেনি। তার প্রধান কারণ, নলকূপের জলের অপ্রাচুর্য। এখানে উল্লেখ করা প্রযোজন যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জলসেচের জমির পরিমাণ মোট কৃষিযোগ্য জমির প্রায় ১৫ শতাংশ।

উপসংহার : বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পূর্ণ ভাবেই কৃষি নির্ভরশীল। কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত এই উপত্যকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। যদিও আমাদের দেশে ষাটের দশকে কৃষিক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লব' অর্থাৎ খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল। এর মূল কারণ ছিল কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক ও কৃত্রিম উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার। বরাক উপত্যকায় এখনও পর্যন্ত কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির বহুল প্রসার সম্ভব হয়নি। তার প্রধান কারণ জলসেচ ব্যবস্থার অভাব এবং সাথে সাথে এই উপত্যকার বন্যাপ্রবণতা। তাই কৃষিক্ষেত্রে বিকাশের জন্য প্রয়োজন জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার এবং বন্যা প্রতিরোধক ব্যবস্থা।

এই ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায় যে, এই উপত্যকার কৃষকেরা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ প্রগতিশীল। ন্যূনতম জলসেচ ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও ধানের উৎপাদনের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, কোনও কোনও বৎসর এই উপত্যকার গড় উৎপাদন সমগ্র আসাম এমন কি সারা দেশের তুলনায়ও বেশি। অর্থাৎ বৃষ্টি নির্ভরশীল এই উৎপাদন ব্যবস্থায় 'মৌসুমী বায়ুর জুয়া খেলার' মধ্যেও এই উপত্যকার কৃষকেরা নিজেদের দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জলসেচ ব্যবস্থার পরিকাঠামো অনেক কম থাকা সত্ত্বেও এই উপত্যকার কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত। তাই এই উপত্যকার জলসেচ ব্যবস্থার বিকাশের ওপরেই কৃষি উন্নয়ন নির্ভরশীল। মুক্ত বাণিজ্যে এবং মূলত বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত বাণিজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন হওয়ার সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক শিল্প উৎপাদন পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপরই এই উপত্যকার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল।

সহায়ক গ্রন্থ সূত্র

১ Agricultural Growth and Regional Economic Development, Niranjan Roy and M.P. Bezbaruah, 2002. Mittal Publications, New Delhi.

২ Economic Reforms and Agricultural Development in North-East India, Keya Sengupta and Niranjan Roy (eds), 2003, Mittal Publications, New Delhi.

৩ Peasant Agriculture in Assam, M. M. Das. 1984, Inter India Publications, New Delhi.

আসামের বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক চিত্র ঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পরিতোষচন্দ্র দত্ত

জনসংখ্যা-বিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই একটি দেশ বা রাজ্য তথা উপত্যকার আর্থ-সামাজিক চিত্র গড়ে ওঠে।

জনস্ফীতি বর্তমানে সমগ্র বিশ্বেই প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি উন্নত দেশকে বাদ দিলে মোটামুটি অনুন্নত সমস্ত দেশেই এই সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এবং রাষ্ট্রসংঘের জনসংখ্যা সংক্রান্ত কমিটির এক প্রতিবেদনে ভারত সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একইভাবে চলতে থাকলে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২০০ কোটির সীমা পেরিয়ে যাবে এবং এর পরিণাম হবে মারাত্মক। জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রতিবেদন আলোচনাক্রমে বেসরকারি সংগঠনসমূহ এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের এ ব্যাপারে ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে জনসংখ্যা হ্রাসে সক্রিয় তৎপরতা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, রোজগার সর্বক্ষেত্রেই সমস্যা বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে। কারণ, এ সবই মানুষের সুস্থ জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি একবিংশ শতকের মানব সভ্যতাকে এক বিরাট প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে, যাকে কোনওভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা দেখা দেয় আইন-শৃঙ্খলাসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে। সীমা অতিক্রম করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সামাজিক সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। এই সামাজিক সমস্যার মূল কারণ দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদ। সর্বক্ষেত্রেই ভারসাম্যহীনতার ফলে সমাজবিরোধী প্রবণতা বেড়ে যায়। বিচ্ছিন্নতাবোধ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা ইত্যাদির কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, মূলত আর্থ-সামাজিক বৈষম্যই এর কারণ। আর বৈষম্য থেকেই অন্তর্জ্বালার সূচনা এর বহিঃপ্রকাশ ঘটলেই বিচ্ছিন্নতাবোধের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সকল জাতি গোষ্ঠীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর হওয়া অসম্ভব।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে জরুরি। কারণ, যে সমস্ত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে একটি দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরি হয়-জনসংখ্যা তাদের অন্যতম। অন্যদিকে সমাজের সার্বিক উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। সমাজের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার অগ্রগতির ওপর। শিক্ষা হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের প্রধান যন্ত্র। তাই শিক্ষাকে সমাজের মেরুদণ্ড হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগ আজ অবহেলিত এবং নানারকম দুর্নীতির নাগপাশে জড়িয়ে এক কলুষিত সমাজের সৃষ্টি করছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, উচ্চশিক্ষার মাঠে ঢোকার প্রথম দরজা পার হতে গিয়ে আহত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে নেয় শতকরা ৯০-৯৫ জন এবং জীবনের লক্ষ্যের মূলস্রোত থেকে বিচ্যুতি ঘটে। বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা, আর্থ-সামাজিক সঙ্কট এবং সর্বোপরি কালোহাতের আগ্রাসনকে মূলত নৈরাশ্যজনক শিক্ষাব্যবস্থার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে সংগঠিত অর্থনৈতিক উন্নতির অভিযান ১৯৫১ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। দীর্ঘ ৫৩ বছরের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক উন্নতির কিছুটা ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা গেলেও এই পরিকল্পনা ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক প্রগতির ওপর বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। পরন্তু আঞ্চলিক বৈষম্য দিনদিন বেড়েই চলেছে। বরাক উপত্যকার আর্থিক প্রগতির বিশ্লেষণ করতে গেলেই তার সঠিক চিত্র পাওয়া যায়।

সমগ্র ভারতবর্ষের মাত্র ২.৪ শতাংশ (৭৮৫২৩ বর্গ কিঃমিঃ) ভূমির অধিকারী আসাম রাজ্যকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, বরাক উপত্যকা ও পার্বত্য অঞ্চল। আসাম রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তের তিনটে জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকা (৬৯৪১.২ বর্গ কিঃমিঃ) আন্তর্জাতিক সীমান্তের পাশে থাকায় এর গুরুত্ব অনেক বেশি। ৯২০.১৫'-৯৩০.১৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২৪০৮'- ২৫০৪' উত্তর অক্ষাংশের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ভারতবর্ষের এই উপত্যকার উত্তরে উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চল ও খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়, পূর্বে মণিপুর রাজ্য, দক্ষিণে মিজোরাম এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা রাজ্য ও বাংলাদেশের সিলেট জেলা। ১৮৭৪ সালে প্রদেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশ রাজ সেই সময়কার সুরমা উপত্যকার কিছু অংশ বাদ দিয়ে আসামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ এই সংবেদনশীল বরাক উপত্যকার আর্থ-সামাজিক চিত্রের এক করুণ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

শান্তির দ্বীপ (!) আখ্যায় আখ্যাত বরাক উপত্যকাকে প্রকৃতি এত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলেও নেহাৎ পরিচর্যা ও পরিকল্পনার অভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার এই শান্তির দ্বীপকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচাইতে পিছিয়ে পড়া স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।

এই উপত্যকার সংস্কৃতি এবং জনবিন্যাসে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। ডিমাসা-কাছাড়ি রাজাদের পৃষ্টপোষকতাতেই সমতলীয় কাছাড় তথা বর্তমান বরাক উপত্যকায় বাংলাভাষা সার্বিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। শতকরা প্রায় ৭৭.২ শতাংশ বাঙালির সঙ্গে বাস করছে মণিপুরি, ডিমাসা, কাছাড়ি, বর্মন, খাসিয়া, কুকি, নাগা, মিহিং, রাভা, মার, অসমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী। তবে এই উপত্যকার দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, বন্যা বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, বিদেশী সমস্যা, প্রশাসনিক দুর্নীতি, সরকারি বঞ্চনা, ধর্মীয় কুসংস্কার, কালোবাজারি ইত্যাদি রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় একটু ভিন্ন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক

সীমান্ত অঞ্চল হওয়ায় এই উপত্যকার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান।

উপত্যকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপত্যকার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে:

ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যা-প্রবণতা
খ) অপর্যাপ্ত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
গ) অনুন্নত অর্থনৈতিক অবকাঠামো
ঘ) সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিদেশী রাষ্ট্রের অবস্থান
ঙ) ব্যক্তিগত খণ্ডে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ
চ) ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কমপক্ষে ২৩-২৫ শতাংশ বেশী মুদ্রাস্ফীতি
ছ) শিল্পে অনগ্রসরতা
জ) বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি

অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করা যে ব্যবস্থায় মানুষ সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু সংগঠিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্ধশতকের পরও বরাক উপত্যকার জনজীবনে ঠিক এক বিপরীত চিত্রই ফুটে ওঠে। এই উপত্যকার দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, বন্যাবিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, প্রশাসনিক দুর্নীতি এরই ইঙ্গিত বহন করে। স্বাভাবিকভাবে উপত্যকাবাসীর মনে সরকারি বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগ জেগে ওঠে।

১৮৭১ সালের স্টুয়ার্টের হিসেব অনুযায়ী এই উপত্যকায় লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২.২০ লক্ষের কাছাকাছি। ১৯৭১ সালে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ১৭.৪৩ লক্ষে। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৫.৫ লক্ষ মানুষের এই ভূভাগে ৭৯ শতাংশ লোক বাংলা ভাষাভাষী, (যা গোটা আসামের ৪৯ শতাংশ), ৬ শতাংশ হিন্দিভাষী, ২ শতাংশ অসমিয়া ভাষী এবং বাকি ১৩ শতাংশ বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ, যেমন বর্মন, মণিপুরি, ডিমাসা, নাগা, কুকি, মার ইত্যাদি। আবার এর মধ্যে ৯২ শতাংশ লোকের বসবাস গ্রামাঞ্চলে। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, এই উপত্যকার লোকসংখ্যা ৩০.৯ লক্ষ, যা গোটা আসামের তুলনায় ১২.৩ শতাংশ। এই উপত্যকার তিনটি জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় প্রতি বর্গ কিঃমিঃ এ লোকসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে ৩৮১, ৫৫৫ এবং ৪০৯ যা সমগ্র রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি (৩৪০)। গত এক দশকে এই তিনটি জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৮.৬৬, ২১.৩৫ এবং ২০.৯২ শতাংশ। সমগ্র আসামের তুলনায় (৯৩২) লিঙ্গ অনুপাতের পরিমাণ এই তিনটি জেলায় যথাক্রমে ৯৪৫, ৯৪৪ এবং ৯৩৩। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় এই উপত্যকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক হারের চেয়ে বেশি। এই বৃদ্ধির

কারণগুলির মধ্যে প্রব্রজনও একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাছাড়া রয়েছে দারিদ্র্যের প্রভাব। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে দেখা যায় দারিদ্র্য রেখার নীচে থাকা লোকসংখ্যার অনুপাত এই উপত্যকায় শতকরা ৪১ ভাগ, যেখানে সমগ্র রাজ্যের ক্ষেত্রে এই অনুপাত শতকরা ৩৬ এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে শতকরা ২৭।

আঞ্চলিক স্তরভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নতির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষের মত এক বিশাল দেশে লোকসংখ্যা ভৌগোলিক আয়তন, ভাষা-সংস্কৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম, জলবায়ু, খাদ্য প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে একটি অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের দৃষ্টান্তমূলক ব্যবধান রয়ে গেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম আসাম রাজ্যেও বিভিন্ন ভাষা, উপভাষা, জনগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের বসবাস। তাই এ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও নানা বিষয়ে ব্যবধান থাকা স্বাভাবিক।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নতির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আঞ্চলিক বৈষম্য আমাদের দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও আমাদের দেশে অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গোটা রাজ্যের কথা মনে রেখে নানারকম পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং বিভিন্ন ধরনের অসমতা দূর করতে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের দেশে অঞ্চলগত অর্থনৈতিক অসমতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে সংগঠিত আঞ্চলিক পরিকল্পনার অভাব। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নতির অভিযান না চালিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য অঞ্চলগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক আঞ্চলিক পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনাব্যতীত আজ এমন কোন উপায় নেই, যা একটি অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এর জন্যই মূলত বর্তমান যুগের অর্থনীতিবিদ্‌রা আঞ্চলিক পরিকল্পনা বা রিজিওন্যাল প্ল্যানিং-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা

উপরিউক্ত আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, আঞ্চলিক বৈষম্য একটি অঞ্চলের আর্থিক বিকাশের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান আলোচনায় আঞ্চলিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বরাক উপত্যকায় এর প্রাসঙ্গিকতার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বরাক উপত্যকা সার্বিকভাবে এক কৃষিপ্রধান অঞ্চল। কিন্তু সঠিকভাবে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলস্বরূপ কৃষি উৎপাদন প্রয়োজনের চাইতে অনেক কম হচ্ছে। ঠিক একইভাবে সম্ভাবনীয় কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে

বর্তমান পরিস্থিতিতে কীভাবে বরাক উপত্যকার আর্থিক বুনিয়াদ শক্ত ও সমৃদ্ধ করা যায় তারই একটি রূপরেখা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর্যালোচনা

দত্ত ও চৌধুরী (১৯৯০) আসামের তিনটি ব্যবসাকেন্দ্র শিলচর, তিনসুকিয়া ও গুয়াহাটির মধ্যে ভোগ্য পণ্যদ্রব্য সামগ্রীর গড়মূল্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শিলচরে ভোগ্যদ্রবসামগ্রীর গড়মূল্য সবচেয়ে বেশি এবং অন্যদুটি কেন্দ্রের তুলনায় কিছুটা বেমানান। উক্ত বিশ্লেষণে এর কারণগুলিও যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দাস (১৯৯১) অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এই উপত্যকার আর্থিক অনগ্রসতার ও প্রতিকূলতার সূযোগ কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর মানুষ সরকারি ও বেসরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রভূত বিত্তবান হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার একদিকে পরিকল্পনার ব্যয় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তুলনায় বরাক উপত্যকায় কম বরাদ্দ করছে। আবার বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটা ব্যবহার করার কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিকল্পনা খাতে যে ব্যয় নির্ধারিত হয়, তার মাত্র ২১ (একুশ) শতাংশ প্রকৃত কাজে ব্যয় হয়।

পাল চৌধুরী (১৯৯১) অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বরাক উপত্যকার আর্থিক বিকাশে নানারকম সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না। ফলস্বরূপ এই উপত্যকার সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। বরাক উপত্যকার সাম্প্রতিক কালের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই উপত্যকার আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ এলোমেলো ও সামঞ্জস্যহীন। এই উপত্যকায় কোন সুষম শিল্পায়ন হয়নি। অন্যদিকে কৃষি উৎপাদনও রয়েছে একটি অস্বস্তিকর স্থিতাবস্থায়। ফলশ্রুতিতে বেকারত্বের বোঝা দিনদিন বেড়েই চলেছে।

দত্ত (১৯৯৪) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বরাক উপত্যকার জনগণের মনে অসন্তুষ্টি এবং চাপা বিদ্রোহ ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়ের ওপর না হয়ে মূলত অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণই (বরাক উপত্যকার প্রতি) এর জন্য দায়ী।

রায় (১৯৯৪, ১৯৯৫) অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এই উপত্যকার আর্থিক সমস্যা এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ভিন্নতর। কিন্তু অর্থনৈতিক পরকল্পনায় এই উপত্যকার বিভিন্ন সমস্যাগুলির যথাযথ প্রাধান্য না দিয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই উপত্যকার আর্থিক উন্নয়নে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি (১৯৯৬) দেখিয়েছেন যে, দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থা এই উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দত্ত (১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৫) পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করে বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, বরাক উপত্যকার আর্থিক অসমতা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই অসমতা দূর করার জন্য বিভিন্ন কার্যসূচি রূপায়ণের ওপর সরকারি অনীহার সমালোচনা করেছেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি রূপায়ণের প্রস্তাবও রেখেছেন।

পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক উপাদান সমূহের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে এই উপত্যকার দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রস্তরের সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে। এই উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম কয়েকটির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

পেশাগত জীবিকা বিন্যাস

জীবিকা বিন্যাসের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মাত্র ২৯ (উনত্রিশ) শতাংশ লোক কর্মজীবী এবং বাকি ৭১ শতাংশ লোক এই ক্ষুদ্র জীবিকা-গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে আসামের মোট ৩৬ শতাংশ লোক বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে যুক্ত (সারণি ১)।

১৯৭১ সালের সাথে ১৯৯১ সালের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাথমিক বৃত্তকলার অন্তর্ভুক্ত কৃষি, কৃষিমজুর মৎসজীবী ইত্যাদির শতকরা অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। ঠিক একই চিত্র আসামের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেলেও বরাক উপত্যকার চিত্র কিছুটা অন্যরকম। কারণ, দেখা যায় ১৯৭১-১৯৯১ সাল সময়ে বরাক উপত্যকায় প্রাথমিক বৃত্তকলার অন্তর্ভুক্ত কর্মজীবী মানুষের অনুপাত ৭৯ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৭০ শতাংশ। অন্যদিকে সমগ্র আসামে ৭৭ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৭৪ শতাংশ। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে এই একই সময়ে বৃদ্ধির অনুপাত ৪.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৫ শতাংশ। ফলশ্রুতিতে, যেহেতু এই উপত্যকায় শিল্পের বিকাশ ঘটেনি, এই কর্মজীবীরা তৃতীয় বৃত্তকলার অন্তর্ভুক্ত জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেয়। লক্ষ্য করা যায় যে, এই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা ১৬.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে গিয়ে ২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এই কুড়ি বছরে মোট কর্মজীবীর অনুপাতের (২৯ শতাংশ) কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ জনপ্রতি কর্মজীবীর বোঝা একই রয়ে গেছে। অথচ একই সময়ে গোটা আসামের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে মোট কর্মজীবীর অনুপাত ২৭.৯৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাড়ায় ৩৬.০৯ শতাংশে। সুতরাং উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ না বাড়ায় এই উপত্যকায় অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার চিত্র ফুটে উঠেছে। উপত্যকার অর্থনৈতিক অবনমনের গতি অটুট রয়ে গেছে। দেখা যায় প্রাথমিক বৃত্তকলার অন্তর্ভুক্ত কর্মজীবী মানুষের অনুপাত গত এক দশকে কমে দাড়িয়েছ ৬৪ শতাংশ, মাধ্যমিক বৃত্তকলার ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ এবং তৃতীয় বৃত্তকলায় এই অনুপাত ২২ শতাংশ। যদিও

উপত্যকার ৭৪ শতাংশ লোক কৃষি বা কৃষি-সম্বন্ধীয় কাজের সাথে যুক্ত, এর বেশির ভাগই মজুর হিসেবে নিযুক্ত। বর্তমানে উপত্যকায় গ্রামের সংখ্যা ২৩৩৬ যা গোটা আসামের তুলনায় ৯.১ শতাংশ মাত্র।

এই প্রসঙ্গে দত্ত ও প্রধান (১৯৯৬) দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১৯৫১-১৯৯১ সাল সময়ে প্রাথমিক বৃত্তকলার অন্তর্ভুক্ত কর্মজীবীর অনুপাত ৭২ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৬৮ শতাংশে এবং এই সময়ে আসামের ক্ষেত্রে ৮২ শতাংশ থেকে কমে ৭৪ শতাংশে পৌঁছেছে। অন্যদিকে তৃতীয় বৃত্তকলার অন্তর্ভুক্ত কর্মজীবীর অনুপাত গোটা ভারতে ১৭.৩ শতাংশ থেকে মাত্র ১৮.৮ শতাংশে পৌঁছেছে এবং আসামের ক্ষেত্র একই সময়ে এই শ্রেণীর কর্মজীবীর অনুপাত ১২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে পৌঁছেছে।

যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থা

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সাধারণত অর্থনীতির স্নায়ুতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। তার কারণ, এর দ্বারাই একটি অর্থনীতিতে মানুষ ও বস্তুর পরিবহন ঘটে। পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশ অনেক দূরবর্তী স্থান এবং সম্পদের উৎপাদন সম্ভব করে পশ্চাদপদ স্থানগুলিকে অপেক্ষাকৃত উন্নত স্থান সমূহে যুক্ত করে। পরিবহনের বিকাশ আমাদের সম্পদগুলির উন্নততর এবং পরিপূর্ণ উপযোগিতা নিশ্চিত করে। ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্রা সেই কারণে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহনের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন।

ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায, প্রাক-স্বাধীনতা আমলে বরাক উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। তবে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই উপত্যকার সাথে দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থার আশানুরূপ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। যদিও আসামের তথা ভারতের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে এই উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা (যেমন, রেল, সড়ক, নৌপথ ও বায়ু) সমস্তই রয়েছে, পরিচর্যা ও সরকারি অনীহার ফলশ্রুতিতে সবগুলি ব্যবস্থারই চলছে প্রচণ্ড দৈন্যদশা। সমগ্র আসামের মোট যানবাহনের তুলনায় মাত্র ৬.৯২ শতাংশ এই উপত্যকায় যেখানে সমগ্র আসামের তুলনায় ১৩ শতাংশ লোকের বসবাস। অন্যদিকে এই উপত্যকা মাত্র ২২৯৬ কিঃমিঃ পূর্তবিভাগীয় সড়কের অধিকারী, যা গোটা আসামের তুলনায় মাত্র ৭.২ শতাংশ (সারণি-২)।

রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই উপত্যকার এক করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। ব্রিটিশ আমলে পরিবহনের সুবিধার্থে যদিও রেলযোগাযোগ (পাহাড় লাইন) ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়, কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে এই অবস্থার উন্নতি না হয়ে বরং অবনতিই হয়েছে বলা যেতে পারে। জনগণের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে সরকার ও তার মদতপুষ্ট আমলা এবং এক শ্রেণীর মানুষ এই উপত্যকার রেল যোগাযোগের উন্নতিকল্পে বাধা দিচ্ছে। তবে ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে পাহাড় লাইন সহ গোটা উত্তরপূর্ব ভারতে রেল যোগাযোগের উন্নতির জন্য সরকার যে ভূমিকা নিয়েছেন, তাতে কিছুটা উন্নতি হবে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু গত এক দশকে উপত্যকার

যোগযোগ অবস্থার উন্নতি না হয়ে অবনতিই হয়েছে বলা যায়। সমগ্র আসামে রেল দৈর্ঘ্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫১৬.২৫ কিঃমিঃ, যা গোটা দেশের তুলনায় ৩.৯৯ শতাংশ। ইতিমধ্যে দুটো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হলেও উপত্যকার জনগণের জন্য অন্ধকার যুগ চলছে বলা চলে। রেল যোগাযোগও একই অবস্থায় চলছে। তাই বলা যেতে পারে, সমগ্র রাজ্য বা দেশের তুলনায় এই উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই করুণ। যোগাযোগ ব্যবস্থা করুণ হওয়ার ফলেই উপত্যকার অর্থানৈতিক অবস্থার উন্নতি অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তাল মিলিয়ে হচ্ছে না।

নতুন সড়ক সেভাবে তৈরি না হলেও যানবাহন সংখ্যা গত এক দশকে উপত্যকায় বেড়েছে ৮৭.৯ শতাংশ। আসামে এই বৃদ্ধির অনুপাত ১১৩.৭ শতাংশ।

সরকারের সদিচ্ছার অভাব এবং বৈষম্যমূলক আচরণই উপত্যকার সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা

সাধারণত কৃষি ব্যবস্থাকে অর্থনীতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলা যেতে পারে। দেখা যায়, অনুন্নত দেশগুলিতে ৭০-৮০ শতাংশ লোকই কৃষিজীবী। এই উপত্যকায়ও ঠিক অনুরূপ চিত্রই লক্ষ্য করা যায়। দত্ত (১৯৯৫) দেখিয়েছেন, এই উপত্যকার অধিক লোকের জীবিকা কৃষি এবং অধিকাংশ লোক ক্ষুদ্রকৃষক এবং কৃষিমজুর। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। অন্যদিকে কৃষকরা বৎসরে মাত্র একবারই কৃষিকাজের সুবিধা পেয়ে থাকে।

জলসেচ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমগ্র আসামের তুলনায় মাত্র ২.৯ শতাংশ জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা রয়েছে (সারণি- ৩)। ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে ৯৬০ হেক্টর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থার লক্ষমাত্রা ধার্য করা হলেও মাত্র ৪১৮ হেক্টর জমিতে কার্যকরী হয়, যা গোটা আসামের তুলনায় মাত্র ৩.৭৯ শতাংশ। কৃষকরা মূলত কৃষির ওপরই নির্ভরশীল। তাই প্রয়োজনীয় জলসেচ ব্যবস্থা থাকলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বেড়ে যেত। তার সাথে অবশ্য প্রয়োজন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতি। আবার ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিদ্যুতের একটা মোটা অংশ জলসেচের জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই উপত্যকায় এই ক্ষেত্রে এক বিপরীত চিত্র ফুটে ওঠে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, জলসেচ ব্যবস্থায় বিদ্যুতের প্রয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে।

গত এক দশকে উপত্যকায় জলসেচ সম্ভাবনা বেড়েছে মাত্র ৩.০২ শতাংশ, যেখানে গোটা আসামে বেড়েছে ১০.৮ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সালের হিসেব অনুযায়ী আসামের তুলনায় মাত্র ৩.৭৯ শতাংশ জলসেচ সম্পাদন হয়েছে। গত এক দশকে উপত্যকায় জলসেচ ব্যবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি হয়নি। মোট জলসেচ সম্ভাবনার মাত্র ২২.১৭ শতাংশ সম্পাদন হয়েছে গোটা আসামে, যেখানে উপত্যকায় এই অনুপাত মাত্র ১৮ শতাংশ।

বাণিজ্য ব্যাঙ্ক

পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ দেখা যায় সমগ্র আসামের তুলনায় এই উপত্যকায় মাত্র ১১

শতাংশ ব্যাঙ্ক অফিস বর্তমান। জমা আমানতের শতকরা অনুপাতের হিসেব মাত্র ৩৩.৫৭ শতাংশ, অন্যদিকে সমগ্র আসামের ক্ষেত্রে এই অনুপাতের পরিমাণ ৪৩.৭৭ শতাংশ। এই উপত্যকার আর্থিক দুরবস্থার এবং অনুন্নত অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রস্তরের চিত্র ফুটে ওঠে এখানে। গত এক দশকে উপত্যকায় অফিসের সংখ্যা কোনরকম বৃদ্ধি হয়নি। জমা-আমানতের অনুপাত আসামের ক্ষেত্রে ২৮.৬০ শতাংশ, যা ভারতবর্ষের তুলনায় (৫৯.৬ শতাংশ) একেবারেই আশাব্যঞ্জক নয়। ২০০৩ সালের হিসেব অনুযায়ী উপত্যকায় জমা আমানতের অনুপাত প্রায় ৪৬.৫ শতাংশ, আসামের ক্ষেত্রে এই অনুপাত প্রায় ৩৫.১ শতাংশ, যদিও গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা একটু অন্যরকম। কিন্তু এখানেও লক্ষণীয় যে, জমা-আমানতের অনুপাতের পরিমাণ কমে আসছে। তাই বলা যেতে পারে যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ভারি ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের জন্য আশানুরূপ কোন পদক্ষেপ এই উপত্যকায় নিতে পারেনি। যার ফলে উক্ত শিল্পগুলির কোনরকম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়নি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অফিস সংখ্যা গত একদশকে কমে গিয়েছে। একই সঙ্গে জমা আমানতের শতকরা অনুপাত ৬৮.৭২ শতাংশ থেকে কমে ৩৪.১২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে গ্রামীণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে।

শিক্ষাব্যবস্থা

মানুষের সভ্যতা ও সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হতে এবং আধুনিকরূপ পরিগ্রহ করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ডের ধারক ও বাহক। অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি সমস্ত কিছুই নির্ভর করে শিক্ষার মানের ওপর। শিক্ষার মানের উন্নতি ব্যতিরেকে সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নতি অসম্ভব।

সর্বভারতীয় এবং গোটা আসামসহ বরাক উপত্যকার শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বরাক উপত্যকা এ ব্যাপারে খুব পিছিয়ে নেই। ১৯৭১-৯১ সাল সময়ে আসামের তুলনায় এই উপত্যকার শিক্ষিতের হার কিছু বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে শিক্ষিতের হার স্বাধীনতা পরবর্তী ৫৭ বছর পরও তেমনভাবে বৃদ্ধি হয় নি। যার মূল কারণ উপত্যকার অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও রাজ্য সরকারের ভুল শিক্ষানীতি, দুর্নীতি ও অনীহা। রাজনীতির কুটিল আবর্তে অধিক সময় নিমজ্জিত থাকায় সঠিক উন্নতির প্রধান শর্ত শিক্ষার প্রসার হয়েছে উপেক্ষিত। বর্তমানকালে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা, সমস্ত ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়মনীতি-বর্হিভূত অবাধ বিচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হয়েছে কলুষিত। শিক্ষাকে বাজারি পণ্যে পরিণত করার ফলে শিক্ষার মান ক্রমশ নীচে নেমে এসেছে।

এই উপত্যকায় সরকারের সাহায্যে চলছে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০ টি মহাবিদ্যালয়, যার মধ্যে রয়েছে সাধারণ স্নাতক মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, আঞ্চলিক কারিগরি মহাবিদ্যালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, আইন মহাবিদ্যালয়, ২৭০ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

৬০টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪২৪২ টি প্রাইমারি ও ১০১৭টি মধ্য বিদ্যালয়। এ-ছাড়াও রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানায় বেসরকারি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়।

২০০১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় পুরুষ, মহিলা বা মোট সমস্ত ক্ষেত্রেই শিক্ষিতের হার আসাম তথা গোটা দেশের তুলনায় বেশি। শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ-ফারাক গত এক দশকে কমে এসেছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৯৮ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষাখাতে গড়প্রতি রাজ্য সরকারের খরচের হিসেব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে আসামের স্থান সর্বনিম্ন (গড় প্রতি বাৎসরিক সরকারি খরচ ৫০৭ টাকা), যেখানে মিজোরামের মত ক্ষুদ্র রাজ্যে এই সরকারি খরচের পরিমাণ সর্বোচ্চ (১২১০ টাকা)।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য সুস্বাস্থ্যের সুযোগ করে দেওয়া। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নানরকম সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল অভিযান, পরিবার কল্যাণ, শিশু কল্যাণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিভিন্ন রোগ সচেতনতা অভিযান ইত্যাদি কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যবস্থা নিলেও বাস্তবে জনগণ তেমনভাবে উপকৃত হয়নি। বাস্তবক্ষেত্রে পর্যালোচনা করলে এই উপত্যকার চিকিৎসা ব্যবস্থার ভয়াবহ নগ্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র আসামের তুলনায় এই উপত্যকায় মাত্র ৭.৮৯ শতাংশ চিকিৎসালয়, ৬.৬১ শতাংশ দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ৮.৬২ শতাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও শয্যা সংখ্যা মাত্র ৯.৭৮ শতাংশ। যদিও গোটা আসামের তুলনায় এই উপত্যকার লোকসংখ্যার অনুপাত প্রায় ১৩ শতাংশের কাছাকাছি।

২০০১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত এক দশকে হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৯টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে ৬৫টি, দাতব্য চিকিৎসালয় মাত্র ৬টি, ও স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫১০৯টি, অর্থাৎ বেড়েছে ৪১৪টি। তবে উপত্যকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যার তেমনভাবে বৃদ্ধি হয়নি। তাছাড়া চিকিৎসাকেন্দ্র গুলিতে চিকিৎসকের অভাব, ঔষধ পত্রের অভাব সাজসরঞ্জামের অভাব বা সাজসরঞ্জাম ব্যবহারে সুযোগের অভাব। ফলে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বলতর শ্রেণীর রোগীদের একটি লক্ষণীয় অংশকে সুচিকিৎসার অভাবে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। অন্য একটি অংশ রোগের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথকেই বেছে নিয়েছে। উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির তুলনায় আসামে এই আত্মহত্যার অনুপাত ৫০.৪ শতাংশ।

এসব বাস্তব তথ্য থেকে এই উপত্যকার প্রতি সরকারি বঞ্চনা বা উদাসীনতার জ্বলন্ত আভাস পাওয়া যায়। চিকিৎসা বিভাগের নানারকম দুর্নীতি সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বাস্তবে ধ্বংস করেছে। চিকিৎসালয়গুলির দৈন্যদশা তথা ভেঙে পড়া চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য একদিকে যেমন দায়ী, তেমনি কিছু দুর্নীতি পরায়ণ সরকারি বেতনভোগী চিকিৎসকেরাও দায়ী বটে।

চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির আলো দেখতে হলে সরকারকে কিছু কঠোর নিয়ম চালু

করতে হবে। একইভাবে চিকিৎসকদেরকেও আত্মসংযম বাড়াতে হবে এবং দুর্বলতর শ্রেণীর জনগণের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে হবে। নতুবা দেশের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হবে না।

চা শিল্প

আসামের ব্রহ্মপুত্র ও বরাক সমতল অঞ্চলে চা শিল্প গড়ে উঠেছে ১৮২৩ সালে। গোটা ভারতবর্ষ, আসাম এবং বরাক উপত্যকার চা শিল্পের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমগ্র আসামের তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ চা এই উপত্যকায় উৎপাদন হয়। চা চাষের উপযুক্ত জমির পরিসংখ্যানগত হিসেবে দেখা যায় যে এই উপত্যকায় ভারতবর্ষের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ এবং আসামের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ জমিতে চায়ের চাষ হয়। ভারতবর্ষের তুলনায় শতকরা ৫২ ভাগ এবং পৃথিবীর মোট চা উৎপাদনের ছয়ভাগের এক ভাগ (১/৬) চা আসামে উৎপন্ন হয়। আসামের মোট শ্রমিকের প্রায় ১৭ শতাংশ এই চা শিল্পে নিযুক্ত। গড় উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই উপত্যকায় প্রতি হেক্টর জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ ১১৪৫ কিলোগ্রাম, যা আসামের ক্ষেত্রে ১৬৮৫ কিলোগ্রাম এবং সমগ্র ভারতে ১৭২৯ কিলোগ্রাম। গত এক দশকে আসামে চা শিল্পের তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। এই সময়সীমায় উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ১৮ শতাংশ।

আসামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষ করে চা শিল্পে অনগ্রসরতার মূল কারণ রাজ্যের অস্থির পরিবেশ, যা এই শান্তির দ্বীপেও আছড়ে পড়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ অন্যতম। বর্তমান সমাজে বিদ্যুতের চাহিদা দিনদিন বেড়েই চলেছে, কিন্তু চাহিদানুযায়ী বিদ্যুতের ঘাটতি থাকায় বিদ্যুৎ সমস্যা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

স্বাধীনতার সময়ে আমাদের দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৩৬০ মেগাওয়াট। আজ সেটা দাঁড়িয়েছে ৯৫.৮ হাজার মেগাওয়াট অর্থ্যাৎ প্রায় ৭০ গুণ বেশি। এই বিশাল উৎপাদন ক্ষমতা আমাদের দেশ ছাড়া পৃথিবীর মাত্র সাতটি দেশেরই আছে। এই দেশগুলো হচ্ছে আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি, কানাডা ও চীন। শুধু চীনকে বাদ দিলে অন্যান্যদের সাথে আমাদের তুলনা করা উচিত হবে না। কারণ জনসংখ্যার দিক দিয়ে চীনের পরের স্থান আমাদের। তাই দেশের বিশাল জনসংখ্যার জন্য মাথা পিছু বিদ্যুৎ খরচের তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আমাদের অবস্থান অনেক অনেক নীচে।

১৯৯৩ সালের মার্চ মাসের হিসেব অনুযায়ী আসামে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ভোগের পরিমাণ ছিল ৯০ কিলোওয়াট (KHW), একই সময়ে গোটা ভারতবর্ষে এর পরিমাণ ছিল ৩৩১

কিলোওয়াট। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বনিম্নস্থান আসাম ও ত্রিপুরার। ১৯৮০-৮১ সালে আসামের অবস্থান ছিল সবার উপরে (মাথা পিছু বিদ্যুৎ ভোগের পরিমাণ ৩৪ কিলোওয়াট)। ১৯৮৪-৮৫ সালে আসামের অবস্থানের অবনতি হয়ে দাঁড়ায় তৃতীয় স্থানে (৪৬ কিলোওয়াট)। ১৯৯২-৯৩ সালে আসাম এসে দাঁড়ায় ষষ্টস্থানে। এই স্থান আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তাই দেখা যায় সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটছে। লোডশেডিং এর পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই সমস্যার উন্নতি ছাড়া শিল্পক্ষেত্রে কোনোরকম উন্নতি তথা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়।

মাথাপিছু বিদ্যুৎ ভোগের পরিমাণকে জীবনের মানদণ্ডের সূচক (Standard of living) তথা দেশের উন্নতির অবস্থান হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একজন আমেরিকাবাসী একজন ভারতীয়ের তুলনায় ২৫ গুণ বেশি বিদ্যুৎ ভোগ করে থাকে। সাধারণভাবে আমাদের আসাম রাজ্য এবং বিশেষভাবে বরাক উপত্যকার বিদ্যুৎ সমস্যা খুবই সংকটজনক। আসামের ৯ শতাংশ ভূমির অধিকারী হয়েও ১৩.৪ শতাংশ লোকের বসবাস এই উপত্যকায়। ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে বরাক ও তার শাখা নদীগুলি মিলিয়ে গোটা ভারতবর্ষের শতকরা ১৩ ভাগ জল (৪৩০ মিলিয়ন একশ ফুট) সম্পদ তৈরি করছে যার দ্বারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সহ জলসেচের ব্যবস্থারও অভূতপূর্ব উন্নতি করা সম্ভব। এছাড়া জল পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি করা সম্ভব। কিন্তু সরকারের নেতিবাচক ভূমিকার জন্য দিনের বেশির ভাগ সময় বরাক উপত্যকা বিদ্যুৎবিহীন হয়ে থাকে। যা আঞ্চলিক বৈষম্য প্রমাণ করে।

বরাক উপত্যকার বিদ্যুৎ চাহিদা (৩৫-৪০ মেগাওয়াট) মেটানোর দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক টানাপোড়েনের পর কাছাড় জেলার বাঁশকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলার আদমটিলায় দুটো গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের ৭০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তায় যথাক্রমে ৪৭ হাজার ও ৬০ হাজার ঘনমিটার গ্যাস নিষ্কাশন সম্ভব হচ্ছিল দুটো তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। আসাম তৈল কম্পানির মাধ্যমে ডি এল এফ কে এই গ্যাস পাঠানো হচ্ছে, যার থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে ডিএলএফ আসাম বিদ্যুৎ পর্ষদকে দিয়ে দিচ্ছে। ডি এল এফ এর সাথে এই ব্যাপারে ২৫ বছরের জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যদিও বাঁশকান্দি ও আদমটিলা কেন্দ্র যথাক্রমে ১৫.৫ মেগাওয়াট এবং ৯.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করতে সক্ষম হলেও প্রথম অবস্থায় মাত্র ১৬-১৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানেও রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

কাগজ শিল্প

প্রায় ৩৫৭ কোটি টাকা খরচ করে ০.৪৪২ বর্গকিঃমিঃ জায়গা জুড়ে বরাক উপত্যকার পাঁচগ্রামে কাগজমিল স্থাপন করা হয়েছে যার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় ১৯৮৮ সাল থেকে। পাঁচগ্রাম কাগজমিলের শহর কলোনির ক্ষেত্রফল ১.২৩৭ বর্গকিঃমিঃ, যেখানে নির্মাণ হয়েছে

৯৩২ টি ঘর ছাড়াও একটি হাসপাতাল, দুটো স্কুল ইত্যাদি।

এই কাগজমিলের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় একলক্ষ মেট্রিকটন, যার মধ্যে রয়েছে ২০ হাজার মেট্রিকটন নিউজপ্রিন্ট এবং বাকি ৮০ হাজার মেট্রিকটন অন্যান্য কাগজ প্রস্তুতের ক্ষমতা। এই শিল্প গড়ে উঠার ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কয়েকহাজার মানুষের অন্নসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এছাড়াও অফিস কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৩৫০ এবং কারখানার কর্মচারী শ্রমিকের সংখ্যা ১১০০। দেখা যায়, ১৯৯৭-৯৮ সালে কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫০,০৩২ মেট্রিকটন, ১৯৯৮-৯৯ সালে ৬০, ৮২৩ মেট্রিকটন, যার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় প্রতি মেট্রিকটন হিসেবে যথাক্রমে ২৩, ১৯৫ টাকা, ২৩, ০৮৩ টাকা এবং ২৩, ৭৪৯ টাকা। শ্রমিক কর্মচারীর মাসিক বেতন সহ অন্যান্য খরচের পর দেখা যায় ১৯৯৭-৯৮ (৬৮৮ লক্ষ), ১৯৯৮-৯৯ (৪৫ লক্ষ) সালে আর্থিক ক্ষতি হলেও ১৯৯৯-২০০০ সালে ৬ কোটি টাকা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

এই শিল্পের কাঁচা মাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহারের জন্য চুনাপাথর কারখানাও স্থাপিত হয়েছে বদরপুর ঘাটে। তবে সরকারের ভুলনীতির ফলে এবং নানারকম দুর্নীতির বেড়াজালে এই শিল্প থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে চা ও কাগজ শিল্প ছাড়াও মুগা রেশম শিল্প, তাঁত শিল্প ইত্যাদি উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে আশাপ্রদ না হলেও কিছু সাহায্য করছে। এই সমস্ত শিল্প ছাড়াও এই উপত্যকায় কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে। বদরপুর ঘাটে সিমেন্ট তৈরির কারখানা রয়েছে। তাছাড়া বাঁশ বেতের দ্বারা তৈরি নানারকম দুর্লভ বস্তুর কারখানা, রাবার শিল্প, বরফ কল, ইট শিল্প, গ্রামীণ কুটীর শিল্প, মুদ্রণ শিল্প ইত্যাদি শিল্পে বরাক উপত্যকার বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ অন্ন সংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে। সমস্ত রকম পঙ্কিল রাজনীতি, দুর্নীতি ও ক্ষুদ্র মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপত্যকার সামগ্রিক উন্নতির চেষ্টা করা হলে এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। এর জন্য উপত্যকার জনগণকেও সজাগ ও সচেষ্ট হতে হবে। তবেই "শান্তির দ্বীপ" নামকরণের স্বার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরিকল্পনা কৌশল (Strategy)

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমতা বজায় না রেখে প্রয়োজনভিত্তিক পরিকল্পনাই বরাক উপত্যকার আর্থিক বিকাশ সাধন করতে পারে। যেহেতু বরাক উপত্যকার "অর্থনৈতিক ভিত্তি" খুবই অনুন্নত, তাই এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষ "দ্বিস্তরীয় পরিকল্পনা" গ্রহণ করা উচিত। একটি স্তর থাকবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য এবং একটি থাকবে অন্যান্য যোগসূত্রকারী বিভাগগুলির জন্য। বিশেষ দ্বিস্তরীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থার পরিকাঠামো নিম্নরূপ : -

প্রথম স্তর : এই স্তরে থাকবে অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়কারী বিভাগগুলি এই স্তরের

বিভাগগুলিতে প্রয়োজন — অত্যধিক পুঁজি বিনিয়োগ। যেহেতু বিনিয়োগের তুলনায় লাভের হার খুব কম, তাই এই বিভাগগুলির সর্বাত্মক উন্নতি সাধন নির্ভর করবে সরকারি বিনিয়োগ পুঁজির উপর। বরাক উপত্যকার জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের বিশেষ বিভাগ থাকবে তিনটি— (১) পরিহবন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, (২) বিদ্যুৎপ্রকল্প ও (৩) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই উপত্যকায় গ্যাসভিত্তিক প্রকল্প গড়ে উঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে কাছাড় জেলার বাঁশকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলার আদমটিলায় প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। শিল্প প্রসারের জন্য যে বিদ্যুতের প্রয়োজন সেই চাহিদা পূরণ করার মত সম্পদ এই উপত্যকায় বর্তমান। তাই রাজ্য সরকারের উচিত ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ সহ অন্য সমস্ত ধরনের নেতিবাচক ভূমিকার ঊর্ধ্ব থেকে এই উপত্যকার সার্বিক উন্নতির চেষ্টা করা।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হচ্ছে বরাক ড্যাম নির্মাণ এবং স্বল্প মেয়াদি ব্যবস্থাগুলির মধ্যে নদীবক্ষ খনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। বরাকড্যাম প্রকল্পের গুরুত্ব বরাক উপত্যকার সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নের জন্য যে খুবই জরুরি এতে সন্দেহ নেই। বন্যাবিধ্বস্ত এই উপত্যকাকে রক্ষা করা ছাড়াও বরাকড্যাম প্রকল্পের যোগসূত্রকারী প্রকল্পগুলির মধ্যে জলবিদ্যুৎ, নালাবিশিষ্ট জলসেচ ব্যবস্থা, মৎস্যচাষ প্রকল্প এবং পর্যটন প্রকল্প উল্লেখনীয়।

দ্বিতীয় স্তর : এ স্তরের বিভাগগুলিতে সরকারি কোন হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খণ্ডে নিয়োজিত থাকবে এই স্তরের বিভাগগুলি। তবে সরকারকে প্রয়োজনভিত্তিক আর্থিক সাহায্য ছাড়াও নিয়মাধীন তত্ত্বাবধান করতে হবে। এই বিভাগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, কলকারখানা ইত্যাদি। বরাক উপত্যকায় কৃষির ওপর নির্ভরশীল পাটকল ও চিনিকল ইত্যাদি গড়ে উঠার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া নানা ধরনের মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে পারে। ব্যক্তিগত খণ্ডে উন্নতির জন্য প্রয়োজন — দক্ষ কারিগরি সংগঠক এবং শ্রমিক শক্তি।

এখানে উল্লেখনীয় যে, বরাকবাসীর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ফসল "আসাম বিশ্ববিদ্যালয়"। শুধুমাত্র পুঁথিগত এবং পরিকাঠামোগত শিক্ষার ওপর জোর না দিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত বিশেষ বিশেষ "স্থানভিত্তিক" কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যার ফলে এই উপত্যকার নবীন যুবকেরা স্বনিয়োজিত প্রকল্পে নিজেদেরকে দক্ষ সংগঠক এবং শিল্পপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা পাবে।

যেহেতু এই উপত্যকা কতকগুলি বিশেষ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যায় পীড়িত, তাই উপরি-উল্লিখিত দ্বিস্তরীয় যোজনা রূপায়ণের ভিত্তি হতে হবে নিম্নলিখিত তিনটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিষয়:

১ আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত সংস্কারের এমন একটি পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ যা সামাজিক সংহতির পরিপন্থী সমস্ত কারণগুলি নিঃশেষে উন্মুল করতে সমর্থ হবে।

২ সাংগঠনিক সংস্কারের এমন একটি পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ, যাতে করে যোজনা রূপায়ণের একটি সহায়ক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।

৩ প্রাথমিক স্তরে প্রযুক্তিবিদ্যা যোগানোর একটি পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ তৈরি করতে হবে।

সারণি - ১
জীবিকা বিন্যাস

ক্ষেত্র বিন্যাস	বরাক উপত্যকা (শতকরা হার)		আসাম (শতকরা হার)	
	১৯৭১	১৯৯১	১৯৭১	১৯৯১
১। প্রাথমিক বৃত্তকলা:	৭৮.৯৩	৭০.৪৮	৭৬.৬	৭৩.৫
ক) কৃষক	৪৬.৭৩	৪০.৯৯	৫৫.৭৬	৫০.৯
খ) কৃষি মজুর	১৯.৯৩	১৭.১৪	৯.৯৪	১২.০৮
গ) গবাদি পশুপালক মৎস্যজীবী ইত্যাদি (Live stock, forestry, fisheries etc.)	১২.২৭	১২.৩৫	১০.৯	১০.৫২
২। মাধ্যমিক বৃত্তকলা:	৪.৭৭	৬.৫১	৫.৫	৬.০৫
ক) খনি সম্বন্ধীয় (Mining & quarraying)	০.০২	০.২৫২	০.৪	০.৪৯
খ) দ্রব্যাদি নির্মাণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত (হস্ত তাঁত শিল্প) (Manufacturing & industries)	১.৬১	১.০১৮	১.৩৯	০.৮৮
গ) দ্রব্যাদি নির্মাণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত (হস্ত তাঁত শিল্প ব্যতীত)	২.০১	৩.৩	২.৭৫	৩.১১
ঘ) নির্মাণ কার্য	১.১৩	১.৯৪	০.৯৬	১.৫৭
৩। তৃতীয় বৃত্তকলা:	১৬.৩	২৩.০১	১৭.৯	২০.৪৫
ক) ব্যবসা ও বাণিজ্য	৪.৮৫	৭.৫১	৫.৬	৬.৮৪
খ) পরিবহন ও যোগাযোগ	২.৪১	৩.০৭	২.৫	২.৫
গ) অন্যান্য	৯.০৪	১২.৪৩	৯.৮	১১.১১
মোট কর্মজীবীর সংখ্যা (লক্ষ)	৪.৯৩	৭.১৪	৪০.৮৮	৬৯.৯২
মোট জনসংখ্যার তুলনায় কর্মজীবীর শতকরা হার	২৮.৭৭	২৮.৬৭	২৭.৯৬	৩৬.০৯

সারণি - ২
যাবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থা

		যানবাহন সংখ্যা	রেলপথ কিঃমিঃ	সড়ক কিঃমিঃ
বরাক উপত্যকা (শতকরা হিসেব আসামের তুলনায়)	১৯৯৩	১৯০৪৩ (৬.৯২)	৩০০.৯২ (১২.৭)	২২৯৬ (৭.২৭)
আসাম	১৯৯৩	২৭৫১৫৮	২৩৬৬.৩৬	৩১৫৪৮
বরাক উপত্যকা	২০০৩	৩৫৭৯০	-	-
আসাম	২০০৩	৫৮৮২৫৯	২৫১৬.২৫	৩৪৪২২.৬২

সারণি - ৩
জলসেচ ব্যবস্থা

১৯৯৩-৯৪	জলসেচ সম্ভাবনার সৃষ্টি (হেক্টর)	লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর)	সম্পাদনা (হেক্টর)	সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার (হেক্টর)
বরাক উপত্যকা (শতকরা হিসেব	১৩৭৯৬	৯৬০	৪১৮	৩৫৩৩
আসামের তুলনায়)	(২.৯৪)	(৩.৭৬)	৩.৭৯)	(১.৬৪)
আসাম	৪৬৯০৯১	২৫৫১০	১১০২০	২১৪৯২২
আসাম (২০০৩)	৫২০০৪০	-	৭৯৩৭০	-

সারণি - ৪
চা শিল্প

	উৎপাদন (হাজার টন)	চা বাগানের ক্ষেত্রফল	গড় উৎপাদন (কি.গ্রা. প্রতি হেক্টরে)	বাগান সংখ্যা	দিনমজুর ও অন্যান্য
কাছাড় (বরাক উপত্যকা)	৪০১৭৪	৩৫০৭৫	১১৪৫	১২১	৭০২৮৮
আসাম	৩৮৮১৮১	২৩০৩৬৩	১৬৮৫	৮৪৮	৫৪১৬৬১
ভারতবর্ষ	৭২০৩৩৮	৪১৬৫৬৩	১৭২৯	১৩৮৬১	৯৮৬৭৮১
আসাম (২০০৩)	৪৫০১৩২	২৬৯০০০	-	-	-

সারণি - ৫
বাণিজ্য ব্যাঙ্ক

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক	অফিস সংখ্যা	জমা (লক্ষ টাকায়)	আমানত (লক্ষ টাকায়)	জমা আমানত অনুপাত (শতকরা)
১৯৯৩				
বরাক উপত্যকা	১৩৫	২৭৩৯২	৯১৯৫	৩৩.৫৭
আসাম	১২২৮	৩১২৮৬১	১৩২২৯২	৪২.২৮
২০০৩				
বরাক উপত্যকা	১৩৪	১৩৩৪১৯	২৮৮০৯	
আসাম	১২২৮	১২৯২১৩১	৩৬৯৫১২	২৮.৬০
আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (১৯৯৪)				
বরাক উপত্যকা	৪৪	১৩১৬	৭৯১	৬০.১১
আসাম	৪০৬	২২৮৭৯	১৩২৬৬	৫৭.৯৮

সারণি - ৬
চিকিৎসা ব্যবস্থা

১৯৯৩-৯৪	হাসপাতাল সংখ্যা	শয্যা সংখ্যা	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	দাতব্য চিকিৎসালয়	উপকেন্দ্র
বরাক উপত্যকা	১২	১২৩৩	৪৭	২১	৬২৩
(শতকরা হার)	(৭.৮৯)	(৯.৭৮)	(৮.৬২)	(৬.৬২)	(১৩.২৭)
আসাম	১৫২	১২৬০৩	৫৪৫	৩১৭	৪৬৯৫
আসাম (২০০১)	১৬১		৬১০	৩২৩	৫১০৯

সারণি - ৭
শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষিতের হার	১৯৭১			১৯৯১			২০০১		
(শতকরা হিসেবে)	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
বরাক উপত্যকা	৪০.৪২	১৯.৯০	৩০.৫৭	৬৪.১৮	৪৮.৯৬	৫৫.৮৭	৭৬.৯৫	৫৭.১৫	৬৭.২৬
আসাম	৩৬.৬৮	১৮.৬৩	২৮.১৪	৬১.৮৭	৪১.০৩	৫২.৮৯	৭১.৯৩	৫৬.০৩	৬৪.২৮
ভারতবর্ষ	৩৯.৫২	১৮.৭০	২৯.৪৮	৬৪.১৩	৩৯.২৯	৫২.২১	৭৫.৮৫	৫৪.১৬	৬৫.৩৭

শিক্ষায় লিঙ্গ ফারাক	১৯৯১	২০০১
কাছাড়	২০.০৩	১৬.৬৭
করিমগঞ্জ	১৯.২৯	১৩.৭৮
হাইলাকান্দি	২৩.০৪	১৭.৮২

স্কুল/কলেজের সংখ্যা	প্রাইমারি	মধ্য	উচ্চ মাধ্যমিক	উচ্চতর মাধ্যমিক	মহাবিদ্যালয় + অন্যান্য
কাছাড়	১৭১৩	৪১০	১৩৯	২৭	১১+৩
করিমগঞ্জ	১৪০২	৩৪৭	৯২	২৪	৭+২
হাইলাকান্দি	১১২৭	২৬০	৩৯	৯	২

সূত্রনির্দেশ

1. Dass, S.K. (1991) : ‘বরাক উপত্যকার আর্থিক বন্ধ্যাত্ব : একটি প্রাথমিক অভিমত’, তিতুমির
2. Dutta, P.C, (1992) : Certain Aspects of Consumer Behaviour in Assam: An Empirical Study, UNPUBLISHED Ph.D. THESIS, G.U.
3. Dutta, P.C. (1994) : ‘Social Movements in the North Eastern Region with Special Reference to Women, Youth and Religion: A Case

Study of Barak Valley'. Paper presented at NEICSSR Seminar, Shillong, 26-27 Aug., 1994

4. Dutta, P.C. (1995) : 'Effect of Occupational Differences in Consumption Pattern in Barak Valley of Assam: A Case Study', Journal of North East India Council for Social Science Research, Vol-19, No.-2, 1995.

5. Dutta, P.C. (1995) : 'Classification of Household Items of Consumption: A Case study of Barak Valley'. Paper presented in the National Seminar, Karimganj College Science Forum, 5-7 Nov., 1995.

6. Dutta, P.C. and Choudhury, H. (1990) 'Inter and Intra Price Structure of Assam: 1963-74 & 1975-84: A Case Study', Gauhati University Journal of Science, Vol- 30 A, pp.36-44

7. Dutta, P.C. and Pradhan, B.C. (1995) : 'Problems of Community Interation in Small Towns of Barak Valley Districts of Assam: A Case Study of Lala Town', Paper presented in the Seminar, NEICSSR, Shillong, 20-21 Nov., 1995.

8. Dutta, P.C. & Pradhan, B.C. (1996) : 'Social Hindrances to Economic Development of Assam in the North East India', Paper presented in the National Seminar, NEICSSR, Shillong, 26-27 July, 1996.

9. Paul Choudhury. P (1991) : 'বরাক উপত্যকা-আত্মনির্ভরশীল প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গড়ে উঠার বাস্তব ভিত্তি', তিতুমির

10. Roy. N. (1994) : 'Planning for Barak Valley: An Area Oriented Approach', Paper presented at the National Seminar, Assam University.

11. Roy. N. (1995) : 'বরাক উপত্যকার আর্থিক বিকাশ: একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা', Journal of Science Forum, Karimganj College.

12. Roy, N. (1996) : 'Transport Communication in the Perspective of Urbanisation : A Case Study of Silchar Town', Paper presented at the Seminar, Economics Deptt., Assam University.

13. Titumir Assesment Bureau (1991) : 'বরাকের পৃথকীকরণ ও এই উপত্যকার উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সমীক্ষা'

14. Statistical Hand Book, Govt. of Assam (1994)

15. Statistical Abstract, Govt. of Assam. (1978)

16. Statistical Hand Book, Hailakandi District (1994)

17. Statistical Hand Book, Karimganj District (1994)

18. Statistical Hand Book, Cachar District (1994)

19. Cenus: 2001, Govt. of India

20. Other Reports.

ALLAHABAD BANK

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

CELEBRATING 140th YEAR
OF ITS DEDICATED SERVICE TO THE NATION

OFFERS

- Allahabad Bank Kishan Shakti Yojana.
- Allahabad Bank Kishan Credit Card.
- All bank Tractor Finance.
- All bank Saral Loan.
- All bank Car Loan.
- All bank Housing Loan.
- Allahabad Bank Educational Loan.
- All bank Property Loan.
- All bank Mobike Scheme.
- All bank Griha Mangal Scheme.
- All Abhusan Scheme.
- Free Personal Accident Insurance Cover of Rs. 1.00 lakh to saving Bank Accounts Holders (conditions apply)
- Insurance for Saving Bank and Current Account holders at a very low premium.

CONTACT NEARBY BRANCHES OF ALLAHABAD BANK